অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের চিত্রকলায় মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে
এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস
রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ৩১
শিক্ষাবর্ষ (সেশন)-২০১৪-২০১৫
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. নাজমা বেগম
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা,জুন ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, মাস্টার অব ফিলসফি (এম.ফিল) ডিগ্রীর জন্য আমার দ্বারা রচিত''অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের চিত্রকলায় মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাবনা'' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ন আমার নিজস্ব এবং মৌলিক কাজ।আমার জানা মতে এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত আর কোনো গবেষক কাজ করেননি।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ কিংবা সম্পূর্নটি, কোনোভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা এরকম কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের ডিগ্রী, উপাধি পওয়ার জন্য বা এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়নি।

অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৩১
শিক্ষাবর্ষ (সেশন) ২০১৪-২০১৫
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

'অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের চিত্রকলায় মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাবনা' শীর্ষক এম. ফিল গবেষণা পত্রটি জনাব অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস আমার প্রতক্ষ্য তত্ত্বাবধানে শেষ করেছেন।এই অভিসন্দর্ভটি তাঁর নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জনামতে উক্ত শিরোনামে অন্য কোনো ব্যাক্তি গবেষণা সম্পাদন, কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন বা প্রকাশ করেননি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য আমি উপরে উল্লেখিত গবেষককে এই অভিসন্দর্ভটি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলের অনুমতি প্রদান করছি।

ড. নাজমা বেগম
অধ্যাপক,
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার জন্য আমি প্রথমে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার গবেষণা তত্বাবধায়ক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. নাজমা বেগমকে । তাঁর গভীর জ্ঞান, দিক নির্দেশনা এবং সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ আমার এম.ফিল (১ম বর্ষের কোর্স শিক্ষক) ড.এ কে এম খাদিমুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যাঁর মূল্যবান পরামর্শ ব্যাতিরেকে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন বা সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। আমি তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই শিল্পী সৈয়দ আবুল বারাক্ আল্ভি স্যারকে, অধ্যাপক (অব:) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, যাঁর অনুপ্রেরণায় আমি এম.ফিল গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছি। ড.শাহরিয়ার তালুকদার, অধ্যাপক (অব:), চরুকলা ইনস্টিটিউট চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পী ও শিল্প সমালোচক মোস্তফা জামান প্রমুখ যাঁরা মূল্যবান বইপত্র,পরামর্শ দিয়ে সব সময় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। উক্ত বিভাগের অগ্রজ গবেষকদের কাছ থেকে আমি সব সময় নানানভাবে সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি । অমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।যেসব লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছি যেমন- ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা চারুকলা অনুষদের লাইব্রেরি,বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র লাইব্রেরি, শান্ত-মরিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির লাইব্রেরি,এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরি, জ্ঞান তাপস আব্দুর রাজ্জাক পাঠাগার, পশ্চিমবঙ্গের গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম, আশুতোষ মিউজিয়াম ইত্যদি এবং সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরিতে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে আমার সুখ-দুঃখের সাথি আমার স্ত্রী জয়া ভৌমিক ও আমার একমাত্র কন্যা অরোরা বিশ্বাস যারা আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন ও সফল করার জন্য যে প্রেরনা যুগিয়েছ তা চিরস্বরনীয় হয়ে থাকবে।

অপূর্ব রঞ্জন বিশ্বাস
এম.ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ৩১
শিক্ষাবর্ষ (সেশন) ২০১৪-২০১৫
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা ০১-১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ১৪-৫২

২. প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগীয় ভারতের অমুসলিম চিত্রকলা

২.১ পাল আমলের পুঁথি চিত্রকলা

২.২ জৈন চিত্রকলা বা পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলা

২.৩ বৈষ্ণব পুঁথি চিত্রকলা

২.৪ ভারতে মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব ও বিকাশ

২.৫ বাবুর ও হুমায়ুনের আমলে মুঘল চিত্রকলা

২.৬ আকবর থেকে জাহাঙ্গীরের সময়কালে মুঘল চিত্রকলা

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ৫৩-৬৬

৩. মুঘল চিত্রকলার পতন ও প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার বিকাশ

৩.১ শাহজাহানের সময়কালে মুঘল চিত্রকলা

৩.২ প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব ও বিকাশ

চতুর্থ অধ্যায় : ৬৭-৭৭

৪. বাংলায় কোম্পানি আমলের মুঘল চিত্রকলা ও ইউরোপীয় চিত্রকলার অভিঘাত

৪.১ কোম্পানি আমলে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব

৪.২ বাংলার প্রাদেশিক চিত্রকলায় ইউরোপীয় চিত্রকলার অভিঘাত

পঞ্চম অধ্যায় : ৭৮-৮৬

৫. বেঙ্গল স্কুল ও প্রাচ্য চিত্রকলার চর্চা

৫.১ হ্যাভেল, অবণীন্দ্রনাথ ও নিও বেঙ্গল স্কুল

৫.২ ভারতে প্রাচ্য চিত্রকলার চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : ৮৭-১০৮

অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আব্দুর রহমান চুঘতাইয়ের চিত্রকলায় মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাবনা

সপ্তম অধ্যায়: ১০৯-১১১

উপসংহার ১০৯-১১১

পরিশিষ্ট : ১১২-১২৪

শব্দকোষ: ১২৫-১২৮

গ্রন্থপঞ্জি ও সাময়িকী ১২৯-১৩২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচি

চিত্র .১ .২ ভিমভেটকা,নব্যপ্রস্তর যুগ, সূত্র: *ভারতীয় চিত্রকলা (১ম খন্ড)*

চিত্র.৩. মহেঞ্জোদারোর প্রাপ্ত পাথরের যোগিমূর্তি. আ.৩০০০-২০০০ খ্রি.পূ.সূত্র:*এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড আর্ট (৮মখন্ড)*

চিত্র.৪ মহেঞ্জোদারোর প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের নারীমূর্তি, আ.৩০০০-২০০০ খ্রি.পূ.সূত্র:*এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড আর্ট(৮মখন্ড)*

চিত্র.৫. হরপ্পা পটারি,নকশা সম্বলিত মানুষ ও জীবজন্তু ,আ.৩০০০-২০০০ খ্রি.পূ.সূত্র: *ভারতের চিত্রকলা (১ম খন্ড)*

চিত্র.৬.মহেঞ্জোদারো পটারি,ফুল,লতাপাতা সম্বলিত চিত্র,আ.৩০০০-২০০০খ্রি.পূ.সূত্র: *ভারতের চিত্রকলা (১ম খন্ড)*

চিত্র.৭.৮. পান্ডুরাজার ঢিবি কৃষ্ণকায় পটারিতে প্রাপ্ত ময়ুর ও মাছের ছবি,আ.১২০০ খ্রি.পূ.
সূত্র:ভারতের চিত্রকলা

চিত্র-০৯, বুদ্ধ মূর্তি,গান্ধার,সূত্র: *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*

চিত্র-১০, জাতক কাহিনীর দৃশ্যে বিভিন্ন দিকের পরিপ্রেক্ষিতের দৃশ্য,সূত্র:*অজন্তা*

চিত্র-১১,অজন্তায় প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের মতো করে দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ আঁকা হয়েছে,সূত্র:অজন্তা

চিত্র-১২, ষাড়ের লড়াই,অজন্তার মুরালচিত্র,সূত্র:*অজন্তা*

চিত্র- ১৩, পাল পুথিচিত্র পঞ্চরক্ষা,(বুদ্ধ ধর্মের রক্ষাদেবী), ১০৪০ খ্রি.সূত্র: *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা*

চিত্র-১৪, জৈন পুথিচিত্র কল্পসূত্র,মহাবীরের জন্ম ,অস্বচ্ছ জলরং,শেষ ১৫শতক-১৬শতকের প্রথমার্ধ,
সূত্র: উইকিপিডিয়া জৈন মেনুস্ক্রিপ্ট পেইন্টিং,তারিখ২/৭/১৯

চিত্র-১৫, বৈষ্ণব পাটাচিত্র, রাসলীলা,বাকুরা,১৭শতক, সূত্র:কলকাতা আশুতোষ মিউজিয়াম

চিত্র-১৬,কামাল উদ-দীন বিহযাদ, খামসা-ই- নিজামী,'খওয়ারনাক দূর্গ নির্মান' ,১৪৯৪ খ্রি.
লন্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়াম ,সূত্র:*ইসলামী চিত্রকলা*

চিত্র-১৭, রিজা ই আব্বাসি,'সাকি', ১৫৯৩-১৬২৯ খ্রি . তেহরান মিউজিয়াম অব ডেকোরেটিভ আর্টস সূত্র: *ইসলামী চিত্রকলা*

চিত্র-১৮,আবুল কাশেম ফেরদৌসী, 'শাহনামা' (৯৩০-১০২০ খ্রি.) দৈর্ঘ্য ৯ .২.৫ ইঞ্চি x প্রস্থ ৫.২.৫ ইঞ্চি, সংগৃহিত-ঢাকা জাদুঘর, সূত্র: বাংলাদেশ ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনীর পরিচিতি

চিত্র-১৯,সম্রাট আকবর প্রাণীহত্যা অবসানের নির্দেশ দিচ্ছেন,আকবরনামা,আ.১৫৯০ খ্রি. সূত্র:*ভারতের চিত্রকলা*

চিত্র–২০ , একজন ইউরোপিয়ান(এ্যালবাম চিত্র) মাপ- ৩০সি.এম.x১৮.৩ সি.এম.সংগৃহিত: ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম,সূত্র:ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং

চিত্র -২১,'নারী পরিবেস্টিত কৃষ্ণের হারেমে উৎসর্গকৃত ঘোড়া' ,রজমনামা পান্ডুলিপি চিত্র, ১৫৯৮ খ্রি. শিল্পী-ভগবান, সাইজ-২২.৯ x ১৪ সি.এম. সংগৃহিত : ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন ,
সূত্র:ললিতকলা একাডেমী পোর্টফোলিও, কলকাতা

চিত্র-২২,মৃত্যুপথযাত্রী এনায়েত খাঁ, ১৬১৮ খৃ. ১২.৫x ১৫.৩ সে.মি.সংগৃহিত: বডলিন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

চিত্র-২৩,জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন (এ্যালবাম চিত্র),১৬১৮-২২ খ্রি.২৪ x ১৫সি.এম.সংগৃহিত:ফ্রিয়ার গ্যালারি অফ আর্ট, ওয়াশিংটন,সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

চিত্র-২৪,রাজকুমার খুররমের তুলাদান অনুষ্ঠান (তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরীর মিনিয়েচার চিত্র)
১৬১৫ খ্রি. ২৬.৬ x ২০.৫ সি.এম. সংগৃহিত-ব্রিটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং গ্রন্থ*

চিত্র-২৫.চেনার বৃক্ষে কাঠবিড়ালি,১৬১০ খ্রি.৩৬.৫ x ২২.৫সি,এম. সংগৃহিত- ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন, সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

চিত্র-২৬,উটের বোঝার ড্রইং, ১৬২০খ্রি. চারকোল গুড়া,কাগজের উপর কালি ও সাথে উচ্চকিত স্বর্ণ,শিল্পী-বাসোয়ান, সাইজ-১১.৬ x১১.৬ সি.এম. সূত্র:*পান্ডুল'স অকশন গ্রন্থ*

চিত্র-২৭,শাহজাহান দারাকে গ্রহন করছেন,১৬৫০খ্রি.মাপ-৩৭.২সিএম x২৫.৪ সি.এম.সংগ্রিহিত-লসএঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অব আর্ট, সূত্র:ললিতকলা একাডেমী পোর্টফোলিও

চিত্র-২৮,সেবক পরিবেস্টিত বিছানার উপর শায়িত যুবরাজ,১৬৪০ খ্রি.মাপ-২৬.৫ x ৩৭ .সে.মি.সংগৃহিত-মিত্তাল মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট ,হায়দারাবাদ,সূত্র:*পান্ডুল'স অকশন গ্রন্থ*

চিত্র-২৯,ক,খ শাহজাহাননামা (শাহজাহান ধর্মীয় অনুসারীদের দরবারে সম্মান জ্ঞাপন করছেন)১৬৫০-১৬৫৩ খ্রি. ৩৫.১ x২৪.২ সে.মি.৩৪.৩ x ২৩.৯ সে.মি.প্রথম ছবিটি ফ্রিয়ার গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট ,স্মিতসোনিয়াম ইনস্টিটিউটে সংগৃহিত ,দ্বিতীয় ছবিটি ফগ আর্ট মিউজিয়ামে সংগৃহিত,সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

চিত্র-৩০,আলমগিরের দরবার,১৬৫৮ খ্রি.মাপ- ১৯.১ x ২১. ৪ সে.মি.ব্যাক্তিগত সংগ্রহ,সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

চিত্র- ৩১,আলমগিরের নিলগাই শিকার ,১৬৬০ খ্রি. মাপ- ২৩.৭ x ৩৯. ৪ সে.মি.সংগৃহিত: চেস্টার বিটি লাইব্রেরি, ডাবলিন,সূত্র: *ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

চিত্র-৩২,মুহাম্মদ শাহ বাগান পরিদর্শন করছেন,১৭৩০-৪০ খ্রি.মাপ-৩৮.৩ x ৪২.৫ সে.মি,সংগৃহিত:মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস, বোস্টন,সূত্র :*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

চিত্র-৩৩,আলিবর্দি খাঁর শিকার দৃশ্য, আ.১৭৫০ খ্রি.সূত্র:*এশিয়াটিক সোসাইটির চারুকারুকলা গ্রন্থ*

চিত্র-৩৪, সপার্ষদ নবাব আলিবর্দি খাঁ,আ.১৭৫০-৫৫ খ্রি.সংগ্রহ-ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম,সূত্র: *বাংলার চিত্রকলা*

চিত্র- ৩৫, একজন বেগমের প্রতিকৃতি,পাটনা,বোর্ড কাগজের উপর পেন্সিল ও সাদা কন্টি,৮ সি.এম x ৬.৫সি.এম, উনিশ শতকের মধ্যভাগ, সংগৃহিত- পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম সূত্র:*পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল পেইন্টিংস গ্রন্থ ভলিউম ৩*

চিত্র-৩৬,' রাধা',মুরশিদাবাদ, হাতির দাতের উপর মিনিয়েচার,৭.১সে.মি x৫.৩সে.মি উনিশ শতকের প্রথম ভাগ,সংগৃহিত-পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম,সূত্র:*পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল পেইন্টিংস গ্রন্থ ভলিউম ৩*

চিত্র-৩৭,শেখ জইনুদ্দিন,'সারস পাখি',কাগজে গোয়াশ ,উনিশ শতকের শেষভাগ,সংগ্রহ:এসমোলিয়ান

মিউজিয়াম অক্সফোর্ড, সূত্র: *বাংলার চিত্রকলা*

চিত্র- ৩৮, শেখ মুহম্মদ আমির,'ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়িসহ সহিশ', কাহজে গোয়াশ, আ. ১৮৪০-৫০খ্রি. সংগৃহিত: ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়াম ,সূত্র: *এশিয়াটিক সোসাইটির চারু ও কারুকলা গ্রন্থ*

চিত্র- ৩৯,উনিশ শতকে ঢাকার কোম্পানি শৈলি, 'মহররমের মিছিল', কাগজে জলরং, ২৪ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি শিল্পী , আলম মুসাব্বির, সংগৃহিত - ঢাকা জাদুঘর ,সূত্র :ঢাকা জাদুঘর ক্যাটালগ গ্রন্থ

চিত্র-৪০, মাদাম বেলনস,'ক্লথ এন্ড সিল্ক মার্চেন্ট',পেন এন্ড ওয়াশ,উনিশ শতক, সূত্র:*টুয়েন্টি ফোর প্লেটস ইলাস্ট্রেটিভ অব হিন্দু এন্ড ইউরোপিয়ানস মেনারস ইন বেঙ্গল*

চিত্র-৪১, রাজা রবি বর্মা,'হিয়ার কামস পাপা',উনিশ শতক, ক্যানভাসে তেল রং সূত্র: *বিংশ শতকের ভারতের চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন*

চিত্র:৪২, থমাস দানিয়েল,'এ ভিউ অফ কলকাতা ফ্রম হুগলি',ক্যানভাসের উপর তৈলচিত্র, ১৭৮৫ খ্রি.সংগৃহিত: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল,কলকাতা,সূত্র:*'পিকচারেস্ক গঙ্গা' পেইন্টিংস বুক*

চিত্র-৪৩,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণলীলা চিত্রমালা (প্রেমের আহ্বান),১৮৯৫-৯৭খ্রি.জলরং(গোয়াশ) সূত্র : *বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন*

চিত্র-৪৪,অবণীন্দ্রনাথ, ভারতমাতা,১৯০৫ খ্রি. জলরং, সূত্র: *বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা :আধুনিকতার বিবর্তন*

চিত্র- ৪৫,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্তিম শয়নে শাহজাহান, ১৯০২ খ্রি. কাঠের উপরে তেলরং, ৩৫.৫৬ x২৫.৪ সে.মি. সংগৃহিত - রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, সূত্র:*বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন গ্রন্থ*

চিত্র- ৪৬,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,তাজ নির্মান,জলরং(গোয়াশ),১৯০১খ্রি. সূত্র:বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা: *আধুনিকতার বিবর্তন*

চিত্র- ৪৭, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষ যাত্রা' , ১৯১৩ খ্রি. কাগজে অসচ্ছ জলরং, ২১ x ১৫ সেমি. ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল গ্যালারি সংগ্রহ,সূত্র:*পেইন্টিংস অব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পপুলার এডিশন*

চিত্র-৪৮, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'উল্লাপাড়া স্টেশন,১৯২৭খ্রি. ৩৬.৮৩ x ২৬.২৭ সি.এম. সংগ্রহ-রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি , সূত্র :*পেইন্টিংস অব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পপুলার এডিশন*

চিত্র-৪৯,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অমর খৈয়াম ', আ. ১৯১১ x ১৯১৬ খ্রি. কাগজের উপর জলরং,সূত্র: *বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্য চিত্রকলার ধারা*

চিত্র-৫০,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মশগুল',১৯৩০খ্রি. সূত্র:ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এলবাম

চিত্র-৫১, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হ্যাঙ্গব্যাক অফ দ্যা ফিশ বোন',জলরং,১৯৩০খ্রি.সূত্র:*বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন*

চিত্র-৫২, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'নুরুদ্দীনের বিবাহ',কাগজে জলরং, ১৯৩০ খ্রি.সূত্র:*বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন গ্রন্থ*

চিত্র-৫৩, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর , আরব্য রজনী চিত্রমালা'ওয়াজির ও শাহজাদী,'জলরং, ১৯৩০ খ্রি. ২৮ x ১৯ সে.মি.সূত্র: *বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন*

চিত্র- ৫৪, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'বাদশা শাহ আলম',অয়াশ এন্ড টেম্পারা অন পেপার,২৫.১ x ৭.৮সে.মি. সংগ্রহ : ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট, সূত্র:মার্গ পত্রিকা(ভলিউম ৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫৫,আবদুর রহমান চুগতাই,'কবির অন্তদৃষ্টি'(পোয়েটস ভিসন),জলরং,১৯৪২-৪৫ খ্রি.মাপ- ৪৯.৫ x ৫৭.৭ সে.মি.সূত্র: *বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন*

চিত্র-৫৬, আবদুর রহমান চুঘতাই,'মা ও শিশু', জলরং, ৫৪ x ৪৯ সে.মি.সূত্র:*চারুকলা জার্নাল ভলিউম* ১ ও ২ *গ্রন্থ*

চিত্র-৫৭, আবদুর রহমান চুঘতাই ,শাহজাহান এবং ওস্তাদ আহম্মদ মিনার ,জলরং ,সূত্র:পিন্টারেস্ট. কম.চুগতাই পেইন্টিং, তারিখ ১৫/০১/১৯

চিত্র-৫৮,আবদুর রহমান চুঘতাই, 'আনারকলি',জলরং,সূত্র: পিন্টারেস্ট. কম.চুগতাই পেইন্টিং,তারিখ ১৫/০১/১৯

চিত্র-৫৯,আবদুর রহমান চুঘতাই, 'হোলিনৃত্য',জলরং,সূত্র: *ভারতের চিত্রকলা ২য় খন্ড গ্রন্থ*

চিত্র-৬০, অসিত কুমার হালদার,' সুরের আগুন', জলরং,৬৪ x ৪৭.৩০সি.এম.সূত্র:*বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা*

চিত্র-৬১, কে. ভেংকটপ্পা,' উটকামন্ডের দৃশ্য', জলরং, ১৯১৭ খ্রি. সূত্র:*বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা: আধুনিকতার বিবর্তন গ্রন্থ*

চিত্র-৬২, ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার,পরশ,জলরং,৩৪.৭ x ১৯.১সি.এম.১৯২০ খ্রি. সূত্র-বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং এলবাম ১

চিত্র-৬৩,নন্দলাল বসু, 'পার্থসারথী', জলরং,৭২ x ৫০সি.এম,১৯১২ খ্রি.সূত্র:বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং এলবাম ১

চিত্র-৬৪, বীরেশ্বর সেন, উত্তরখন্ডের নিসর্গের দৃশ্য, জলরং,সূত্র:আর্ট ডায়রি:বীরেশ্বর সেন,তারিখ ১০/০৩/১৯

চিত্র-৬৫,সুনয়নী দেবী,রাধাকৃষ্ন, জলরং ও গুয়াশ,৫৪.৫ x ২৭.৫ সি,এম,১৯২০ খ্রি.সূত্র:বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং এলবাম ১

চিত্র-৬৬,সমরেন্দ্রনাাথ গুপ্ত, ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি/ হয়ত বাতি জ্বলবে না, প্রবাসি ,জলরং,সূত্র:*রবীন্দ্রনাথের গানের ছবি গ্রন্থ*

চিত্র-৬৭,সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায়, লক্ষণ সেনের পলায়ন,জলরং,১৯০৮ খ্রি.সূত্র:ব্লগ.সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি.তারিখ ৩/০৩/১৯

মুখবন্ধ

সাহিত্যিক ও শিল্পী অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১খ্রি.) এবং শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৪-১৯৭৫খ্রি.) উপমহাদেশের চিত্র শিল্পের জগতে দুজন যুগান্তকারী চিত্র শিল্পী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বেঙ্গল স্কুল' বা 'নব্যবঙ্গীয়' রীতির পথিকৃত বলা হয়। মূলত ঊনিশ শতকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই বেঙ্গল স্কুলের গোড়া পত্তন হয়েছিল। বেঙ্গল স্কুলের আরেক বিখ্যাত শিল্পী হলেন আবদুর রহমান চুঘতাই। যিনি অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সমসাময়িক শিল্পী ছিলেন। এই দুজন শিল্পীর চিত্রকলায় মুঘল চিত্র রীতির প্রভাব বলয় ছিল। এই রীতিটি তাদের হাতে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়। এখানে আমি এই দুই উল্লেখযোগ্য শিল্পীর কাজের বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করেছি।

বং থেকে বাংলা অর্থাৎ বং মানে জলাভূমি আর তার সাথে আল প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাংলা শব্দের উৎপত্তি যা পন্ডিতরা বলে থাকেন। জলাভূমির দেশ হিসাবে অতীত কাল থেকেই এই বঙ্গদেশ পরিচিত। মৎসচারী, কৃষিজিবী, মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের মাঝে অবসর সময়ে বিনোদন, আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় প্রয়োজনে যে শিল্প রচনা করত তাকেই আমরা আমাদের মৌলিক শিল্প বলতে পারি। কাদা পলিমটির দেশে বড় বড় শিল্প চর্চার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। বৈরিক আবহাওয়ার কারণে কাচামালের অভাবে বিশাল আকারের শিল্পচর্চা হয়নি। বিভিন্ন পালা, পার্বন, ব্রতের জন্য যে শিল্প তা অতীতকাল থেকেই এখানে ছিল। উর্বর ভূমির কারণে ফসলের লোভে বারবার আমাদের বিদেশী জাতির দ্বারা শাসিত হতে হয়েছে। ফলে বারবার আামদের শিল্প সংস্কৃতি নানান দিকে মোড় নিয়েছে। তথাপি শিল্পে আমাদের নিজস্ব লোক সংস্কৃতি ধারা বহমান। যেমন- পুতুল, মূর্তি, মুখোশ চিত্র, পট অলংকার, নকশি কাঁথা, ব্যবহার্য পাত্র, পূজার উপকরণ ইত্যাদি। আরেকটি ধারা উচ্চ রাজন্যবর্গ দ্বারা সূচিত হয়েছিল তাকে আমরা 'উচ্চ মার্গীয়' বা 'উচ্চ কোটির' ধারা বলতে পারি। সাধারণত ঃ উপমহাদেশের শিল্পকলা পৃথিবীর ইতিহাসে বেশ পুরনো। এর নিদর্শন পাওয়া যায় আ. ৩০০০-২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিন্ধু, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোতে। এরপর বিভিন্ন গুহাগাত্রে শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- ভিমভেটকা,যোগিমারা গুহা, অজন্তা গুহা ইত্যাদি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে এসে ভারতের এক যুগান্তকারী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই যুগটিকে ভারতের ক্লাসিক্যাল যুগ হিসাবে গণ্য করা হয়। বিহারের পাটালিপুত্রে প্রথম গুপ্ত একটি শক্তিশালী সম্রাজ্য শুরু করেন যা গুপ্ত সম্রাজ্য নামে পরিচিত (সময়কাল আ. ৩২০-৫৪৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)। এই উত্তর ভারতের শিল্পের পরবর্তি বাংলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহনকারী এক উচ্চকিত শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। যা পাল যুগ নামে খ্যাত। পাল আমলের তুলনামূলক সুদীর্ঘ, উদার ও স্থিতিশীল শাসনকাল বাংলার সংস্কৃতিতে তথা শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই সময়ই বিবর্তিত হয়

বাংলার পোড়ামাটির ফলক, পুঁথি চিত্র, পাটা চিত্র ইত্যাদি। পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত ফলক, পুঁথি ও পাটা চিত্রে এদেশের শিল্পীদের পরিচয় পাওয়া যায় উষ্ণ আবেগের, নিজস্ব পরিমাপের, গতিশীলতার এবং বাস্তবাতার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের।

সাধারণত পন্ডিতরা বলে থাকেন মুঘল শব্দের উৎপত্তি 'মোঙ্গল' থেকে। মধ্য এশিয়ার মুসলিম আধিপত্যের কারণে এখানে নব যুগের সূচনা হয়। সম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈমুরের বংশধর ভারতে মুগল সম্রাজ্যের পত্তন করেন। এর সময়কাল ধরা হয় আনুমানিক ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ। বাদশাহ বাবুর ছিলেন মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মুঘল আমলে ভারতবর্ষে মুসলিম চিত্রকলার যেসব নিদর্শন পাওয়া যায় তা সবটাই আকারগত দিক থেকে ছোট ছবি যাকে ইংরেজীতে মিনিয়েচার পেইন্টিং বলা হয়। বস্তুত পক্ষে বাদশাহ হুমায়ুনের আন্তরিক প্রচেষ্ট ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই ভারতের এক বিশেষ রীতির চিত্র চর্চার উন্মেষ হয়। যা পরবর্তিতে মুগল মিনিয়েচার নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। শুরুতে মুঘল মিনিয়েচার সবটাই ছিল পারসিক ধারা মিশ্রিত। পরবর্তিতে পারসিক ও ভারতীয় শিল্পীদের চিত্র সংমিশ্রণের ফলে এক নতুন চিত্ররীতির ধারা তৈরী হয়। এই ধারাকেই পন্ডিতরা বলেছেন মুঘল মিনিয়েচার। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুগল চিত্র উৎকর্ষতার চরম শিখরে পৌঁছে। তিনি ছিলেন চিত্রকলার প্রকৃত সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তিতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুগল মিনিয়েচারে প্রতিকৃতির চলন হয় এবং জীবজন্তুও চিত্রের পরিসর বৃদ্ধি হয়। তাঁর সময় সবচেয়ে সেরা এবং সম্রাটের প্রিয় প্রতিকৃতি শিল্পী ছিলেন ইরানের শিল্পী আগা রিজা, আবুল হাসান, ওস্তাদ মনসুর প্রমুখ এছাড়াও অনন্ত, মোহাম্মদ আলি, ওস্তাদ মিশকিন, হুনহার, ওস্তাদ মোদি, গোবর্ধন, হাসিম প্রমুখ।

সম্রাট শাহজাহান যেমন তাঁর শাসনামলে মুঘল চিত্রকলার উৎকর্ষতা ধরে রেখেছিলেন ঠিক তার উল্টোপিঠে তাঁরই পুত্র ঔরঙ্গজেবের সময় থেকেই মুগল চিত্রকলার দুর্দিন শুরু হয়। ঔরঙ্গজেব যুবাবস্থায় কিছুটা উগ্র ইসলাম ধর্মীয় মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আর ইসলাম ধর্মে চিত্রে কিছুটা বিধিনিষেধ থাকায় ঔরঙ্গজেব মুগল দরবারে চিত্র চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা কমিয়ে দেন। ফলশ্রুতিতে শিল্পীদের পেশাগত রুটি রুজির হুমকির কারণে শিল্পীরা অন্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন সময়ে মুগল সম্রাজ্যের শান-শওকত স্থিমিত হয়ে আসে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ, পাটনা এবং লখনৌতে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে প্রাদেশিক মুগল শৈলী নামে একটি অন্যধারার মুগল চিত্ররীতি চালু হয়।

পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭খ্রি.) ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদে নবাবি শাসনের ধারা স্থিমিত হয়ে পড়ে। ফলে মুর্শিদাবাদ শৈলীর চিত্ররীতির অবক্ষয় শুরু হয়। এই সময় মুর্শিদাবাদ চিত্ররীতি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দরবার বহির্ভূত স্থানীয় চিত্রকলার সহচর্যে পান্ডুলিপি জড়ানো পটচিত্র এবং অন্যটি ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ইংরেজ বনিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের স্বতন্ত্র চিত্ররীতি। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে ওঠা চিত্রকলা পরবর্তিতে কোম্পানি চিত্রকলা নামে পরিচিতি পায়। মুগল দরবারি চিত্র কলার সাথে ইউরোপিয় রেনেসাঁস ধারার চিত্রকলার ধারার মিশেলে অনবদ্য এক ধারার সৃষ্টি হয়। পিরবক্স, শেখ জৈনুদ্দিন, রামদাস, ভবানী দাস, শেখ মুহম্মদ আমির প্রমুখ ছিলেন এই সময়কার অন্যতম প্রখ্যাত শিল্পী।

ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে এদেশীয় শিল্পধারা হারাতে বসেছিল। ভারত শিল্পের অনুরাগী ও প্রচারক ই.বি হ্যাভেল, রদেনস্টাইন, আনন্দ কুমারস্বামী, ভগিনি নিবেদিতা, প্রমুখ অনুধাবন করেন যে প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ধারাকে টিকিয়ে রাখতে উক্ত ধারাটি চর্চা বাঞ্চনীয়। ই.বি হ্যাভেলের অনুরোধে অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় শিল্পকলার হারানো ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। মূলত তাঁর হাত ধরেই 'বেঙ্গল স্কুল' বা 'নব্যবঙ্গীয়' রীতির প্রচলন। 'নব্যবঙ্গীয়' শৈলী চর্চার গুরু দায়িত্বে ছিলেন অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর কৃতি শিষ্যগণ। সূচনা লগ্নের শিল্পীরা হলেন ঃ নন্দলাল বসু,অসিত কুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কে ভেঙ্কটপ্পা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে, হাকিম মহম্মদ খান প্রমুখ। মূলত এদের হাতেই 'নব্যবঙ্গীয়' ধারাটি দৃঢ় ভিত্তিভূমি লাভ করে।

অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১খ্রি.) 'নব্যবঙ্গীয়' ধারার কাজের মধ্যে বিশেষ আলোচ্য দিক হচ্ছে তাঁর চিত্রকলায় মুগল মিনিয়েচারের মিশ্রণ। অবণীন্দ্রনাথ মুঘল মিনিয়েচারের কাঠামো আর রূপসজ্জার সংগে প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের 'ভাব' যুক্ত করে এক অনবদ্য রস সমৃদ্ধ ছবি নির্মাণ করেন। ছবিগুলো হচ্ছে যেমন ঃ- 'আরব্য রজনী'(১৯৩০খ্রি.), 'ওমর খৈয়াম সিরিজ (১৯০৬-১১খ্রি.)', 'অন্তিম শয্যায় শাহজাহান (১৯০২খ্রি.)', 'শেষের যাত্রা (১৯১২খ্রি.)', 'জেবউন্নিসা', 'পারাবাত' ইত্যাদি। সেই সময় লাহোরবাসী অপর শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৪-১৯৭৫খ্রি.) বেঙ্গল স্কুল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক নিজস্ব শৈলীতে চিত্র রচনা করে অবিভক্ত ভারতের মুসলিম সমাজে এবং পরবর্তিতে পাকিস্তানের জনপ্রিয় শিল্পী হয়ে উঠেন। বিষয় নির্বাচনে তিনি ছিলেন উদার। অবণীন্দ্রনাথের মতই তিনি ইসলামি ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা ছাড়াও তিনি হিন্দুদের

পৌরানিক কাহিনী নিয়ে ছবি নির্মাণ করেন। তেমনি একটি জনপ্রিয় ছবি হচ্ছে হোলি নৃত্য,যোদ্ধা অর্জুন ইত্যাদি।

অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সমসাময়িক শিল্পী আবদুর রহমান চুঘতাই এই দুই গুনি শিল্পী উপমহাদেশের প্রাচ্য শিল্পের জগতে এক অনন্য দৃষ্টান্তের অধিকারী। তাঁদের চিত্রকলার নানাবিধ দিক আলোচনা হলেও মূলত, চিত্র শিল্পে মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই দিকটি উপেক্ষিতই থেকে গেছে। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় "অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আবদুর রহমান চুঘতাই এর চিত্রকলার মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাবনা" প্রস্তাবিত বিষয়টি নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এখানে আলোকাপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভারতের চিত্রকলার সূত্রপত ধরতে গেলে এর আদিরূপটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তবে কবে কখন চিত্রকলার সূত্রপাত হয়েছিলো তা সঠিক করে বলা মুশকিল। তবে আদিম যুগে গুহাবাসীদের মধ্যে চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া যায় । একথা ঠিক যে, মানুষের বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে মানুষ অনুকরণ প্রিয় হয়ে উঠে। যেমন - কাঠের গুড়ির চলার ছন্দ থেকে চাকার আবিস্কার বা কাঠের গুড়ির জলে ভেসে বেড়ানো থেকে নৌকা আবিস্কার ইত্যাদি।এই অনুকরণ প্রিয়তাই মানুষকে সুকুমার বৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়। এই সুকুমার বৃত্তির চর্চাগুলো আবার প্রকৃতি থেকে শেখা। বিশেষ করে সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি। চিত্রকলার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে গাছের পাতার যে ছন্দ, দোলায়িত লতা, কুন্ডলিকৃত মেঘের রূপ, নদীর ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার ছন্দ এসবই মানুষ চিত্রে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। আবার প্রানীকুলে চলার ছন্দও মানুষকে রপ্ত করতে দেখা যায়। ধরা যাক, কোনো সরিসৃপ বালি বা কাদামাটির উপর দিয়ে চলে গেলো তার চলার গতির যে ছাপ ফুটে উঠল সেটিই হয়ত পরবর্তিতে চিত্রের উপাদান হয়ে গেলো। চিরায়িত আরেকটি চিত্রের উপাদান হলো মানুষের হাতের পায়ের ছাপ। নরম কাদামাটিতে পায়ের যে ছাপ পড়ে তা পরপর সাজালেই একটি চিত্রের প্যাটার্ন তৈরী হয়ে যায়। হাতের মধ্যে রং মাখিয়ে কোথাও ছাপ দিলে তাও সুন্দর ছবিতে রূপান্তর হয়। সেইরূপ অনুকরণ থেকেই চিত্রের চলার শুরু।'Art' শব্দটা পশ্চিমা বিশ্বে এসেছে artificial থেকে আসা অর্থাৎ artificial-কে কোন কিছুর অনুকৃতি করাকে বোঝায়। আবার ভারতীয় উপমহাদেশে 'চারু' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'চন্' ধাতু থেকে থেকে। আভিধানিক অর্থে 'চারু ' মনোহর, সুন্দর, শোভন, ললিত, কোমল, সুকুমার ইংরেজিতে fine arts কেই নির্দেশ করে। মানুষ যে কোন সুন্দর জিনিস যেমন পাহাড়, সমুদ্র দেখে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সাহিত্যে, গানে, নৃত্যে বা চিত্রে রূপ দিতে পারে। ভারতীয় শিল্পীরা সেই আবেগ কল্পনার জোরই দিয়েছে বেশি। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম দিককার যে গুহাচিত্রগুলোর খবর পাওয়া যায় যেমন- ইউরোপের আলতামিরা (স্পেন), ল্যাসকো (ফ্রান্স), লামুথ (ফ্রান্স),পেয়ার নন পেয়ার (ফ্রান্স), আফ্রিকার তাসিলি ইত্যাদি। তেমনি ভারতে পাওয়া গেছে মধ্যপ্রদেশে ভীমভেট্কা গুহা, উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার মানিকমুন্ডা গুহা ইত্যাদি । ইউরোপের গুহাচিত্রের ন্যায় ভারতে জন্তু-জানোয়ার, শিকারের দৃশ্যই আঁকা হয়েছে বেশি। তখনকার

দিনের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ফুটে উঠে এসব চিত্রে , ছবির বিষয়বস্তু জন্তু-জানোয়ার ছাড়াও জ্যামিতিক রেখা হিজিবিজি অক্ষরও দেখা যায়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এসব গুহাচিত্র খ্রিষ্টপূর্ব বিশ ত্রিশ হাজার বছরের পুরনো। (তবে কার্বন-১৪ তে তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৫০০০ বছর)। [১] পুরাতাত্ত্বিকরা একে আপার-পলিওলিথিক (প্রত্ন প্রস্তর যুগ) পিরিয়ড হিসেবে আক্ষ্যা দিয়েছেন। তবে ঐতিহাসিকরা গুহাচিত্রকলাকে বেশকিছু যুগে ভাগ করেছেন যেমন-প্রত্ন প্রস্তর যুগ(আ.৩০,০০০-২০,০০০খ্রি.পূ.), মধ্যপ্রস্তর যুগ(আ.২০,০০০-১০,০০০খ্রি.পূ.),নব্য প্রস্তর যুগ(আ.১০,০০০-৫০০০ খ্রি.পূ.) ও তাম্র প্রস্তর যুগ(আ.৫,০০০-২০০০খ্রি.পূ.) ইত্যাদি।ভীমভেট্কা গুহার চিত্রের উপকরণ হিসেবে রং দেখা যায় মাটি ও পাথরের আকর গুড়ো করে তৈরী ।এসব চিত্রের রেখার বেশ বলিষ্ঠতা পাওয়া যায়। হরিণ বা চিতা বাঘের ছবির কথাই ধরা যাক। বলিষ্ঠ আউট লাইন করে এতে ফোটা দেয়া এতে প্রানীটির চরিত্রগত বৈশিষ্ঠ্য ফুটে উঠে।(দ্র.চিত্র-১,২) । পরবর্তিতে মানুষ যখন গুহা ছেড়ে ঘরবাড়ি বানাতে শিখল তখনও সেই গুহাচিত্রের পরম্পরাই তারা বাড়ীর দেয়ালে উঠোনে ব্যবহার করল। সেই যাদুবিশ্বাস, টোটেম, মোটিফ ঘুরেফিরে আসতে লাগল। উদাহরণ টানা যেতে পারে প্রাচীনকালের মিশরের কবর বিশেষ করে পিরামিডের দেয়াল, আসিরীয় সভ্যতার বাড়ীর দেয়াল ইত্যাদি বর্তমান সময়কার ভারতের ওয়ারলি আদিবাসীদের বাড়ীর দেয়াল চিত্রের কথাও বলা যেতে পারে। এরপর মানুষ যখন নিত্যপ্রয়োজনে তৈজসপত্র বানাতে শিখল সেখানেও চিত্রের অনুষঙ্গ হিসেবে আলপনা, নানা রকম মোটিফ ব্যাবহার করতে লাগল।

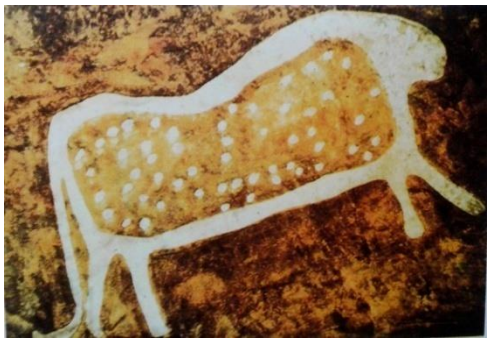

চিত্র- ১ .২ ভিমভেট্কা,নব্যপ্রস্তর যুগ, সূত্রঃ *ভারতীয় চিত্রকলা (১ম খন্ড)*

নব্য প্রস্তর যুগের শেষের দিকে বড় ধরনের সভ্যতার সন্ধান পাওয় যায়। ঐতিহাসিকরা অনেকে একে তাম্রপ্রস্তর যুগ বলে থাকে। অর্থাৎ তখন মানুষ পাথরের হাতিয়ার বাতিল করে তামার ব্যবহার শিখেছিলো, কৃষিকাজ মৎস্যশিকার, মাটির পাত্র (কুম্ভ) ইত্যাদি তৈরী করতে শিখেছিলো। এখানে উল্লেখ্য প্রকৃতির প্রাণী বিশেষ করে হাতি থেকেই মানুষ মাটির পাত্র তৈরী করতে শিখেছিল ।[২] হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সভ্যতায় একটি উন্নত জীবনযাত্রার চিত্র পাওয়া যায় যা বর্তমান সভ্য জগতের সাথে তুলনীয়। এই সভ্যতা কয়েক ধাপে তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ই কিছু তার পূর্বে পাকিস্তানের সিন্ধু, বেলুচিস্তানে ও ভারতের মধ্য প্রদেশে বেশ কিছু উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির খবর পাওয়া যায়। এসব উন্নত সংস্কৃতিগুলো হলো আমরি, কালিবঙ্গান,নান্দারা, নাল, কুল্লি, কায়থা,শাহিটুম্প ইত্যাদি । এসব সংস্কৃতির বয়স ঐতিহাসিকরা নির্ধারন করেছেন্ আ. খ্রি. পূ. ৩০০০-২০০০ বছর।অনেকেই বলে থাকেন এসকল নাম সংগৃহিত অতীত কালে হয়ত অন্য নাম ছিলো। তবে যাই হোক, এসব সভ্যতাতে মাটির খেলনা, ভাড়, খোলামকুচিতে নানা মোটিফ ও ডিজাইন দেখে আধুনিক কালের অনেক বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যায় এবং তাদের জীবন যাত্রার চিত্রও ফুটে উঠে। খোলামকুচির চিত্রতে দেখা যায় স্বস্তিকা, ষাড়, হরিণ, মাছ , বানর, হাঁস, লতাপাতার মোটিফ, জ্যামিতিক রেখা ইত্যাদির সুন্দর সমন্বয়। পন্ডিতরা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সাথে ভারতীয় সভ্যতার মিল খুঁজে পান। উভয় দেশেই লাল ও হলুদ পাত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দু দেশের মধ্যে বানিজ্য সম্পর্ক ছিল বা অভিবাসি জনগোষ্ঠি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াত করত। তাদেরই কোন শাখা এই সভ্যতার ধারক। এসব চিত্রকলার ছাপ এখনও আমরা নকশী কাঁথা, কার্পেট, শাল, বোনা কাপড় চীনা, মাটির বাসন- কোসন , আলপনা , ব্রতের অনুষ্ঠানে আমরা খুঁজে পাই। এসকল চিত্র দেখে বুঝতে পারি প্রাগৌতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ প্রকৃতি থেকে অবলোকন করে এবং নিজেদের তৈরী জ্যামিতিক মোটিফ দিয়ে চিত্র তৈরী করতে শিখেছিলো। জীব-জন্তুগুলো সুন্দর স্টাইলাইজড করে আঁকা। রেখার সাবলিলতা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের রেখা লক্ষ্য করা যায় চিকন, মোটা আবার মাঝে মাঝে ওয়াশ পদ্ধতিও দেখা যায়। কোন কোন সময় মাটির পাত্রে প্যানেল করে বিভিন্ন জীবজন্তু জ্যামিতিক রেখা পর পর এঁকে প্যাটার্ন তৈরী করার প্রবনতাও দেখা যায়। যেমন সিনেমার দৃশ্য সংযোজনের মত অনেকটা সেই রকম। অধিকাংশ ছবি দুই বা তিন রং এ আঁকা। আবার কোন সময় চার রং এর চিত্রও দেখা যায় যেমন- সারফেসের রং এর উপর তিনটি রং নীল, হলুদ, সবুজ রং এর নকশা করা চিত্রও চোখে পড়ে। পূর্বেই হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো (আ. ৩০০০ থেকে ২০০০ খ্রি.পূ.) সভ্যতার কথা

উল্লেখ করা হয়েছে। হরপ্পা পাঞ্জাবের রাবি নদীর তীরে অবস্থিত। অতীতে এই নামটি ছিল না স্থানীয় একটি গ্রাম থেকে এই নামটি দেয়া। মহেঞ্জোদারো (মৃতের ঢিবি) সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রত্নতাত্ত্বিক খোড়াখুড়ি করে টেপা পুতুল, পোড়ামাটির সীলমোহর, ভাস্কর্য ইত্যাদি পাওয়া গেছে। অন্যান্য জমিনে যেমন কাপড়, দেয়ালে চিত্র পাওয়া না গেলেও এসকল জমিনে চিত্র আঁকা হত বলে প্রতিয়মান হয় যা কালের করাল গ্রাসে টিকে নেই। তবে যেসব মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তাতে উন্নত চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোতে কুল্লির মতই স্টাইলাইজড হরিণের ছবি পাওয়া গেছে। হরপ্পায় পাওয়া গেছে মানুষের ছবি। মহেঞ্জোদারোর খোদাইকৃত ষাড় তো ইতিহাসের ল্যান্ডমার্ক। এছাড়াও নানা রকম জ্যামিতিক নকশা যা দিয়ে নানা রকম সিম্বল তৈরী করা হয়েছে বিশেষ করে স্বস্তিকা চিহ্ন, সূর্য, ক্রুশ, তারা , বৃত্ত ইত্যাদির মোটিফ চিত্রকলা ছাড়াও স্থাপত্যের ভূমি নকশায় এবং পরবর্তিতে প্রচুর ব্যবহার হতে দেখি যেমন স্তুপ, মন্দিরে (হিন্দু বৌদ্ধ যুগে), পরবর্তিতে ইসলামী যুগেও মিনার, মাকবারাতে ব্যবহার হতে দেখা যায় । পিপল পাতার মোটিফ নানান ভাবে পরিবর্তীত রূপে বা খিলানের আকারে ব্যবহার হতে দেখি । হরতোন পান পাতার মোটিফও সেই সাদৃশ্যই বহন করে । মূর্তির মধ্যে যোগী মূর্তি পাওয়া গেছে যা খুবই উন্নত মানের। ধ্যানরত মূর্তিটি দেখলে বোঝা যায় তখন মানুষ যোগ সাধনা করত। যোগিরা যেভাবে কাপড় পড়ে ঠিক সেভাবে কাপড় পড়ে একদিকে গা খালি।কাপড়ের নকশাটিতে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট।পরবর্তিতে ভারতীয় চিত্রের মধ্যেও সেই যোগ সাধনার প্রতিফলন দেখা যায় অর্থাৎ ভারতীয় ছবির আধ্যাতিকতার আভাস তখনই পাওয়া যায়(দ্র. চিত্র- ৩) ।নারী ফিগার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে নানাভাবে এসেছে উল্লেখ্য টেপা পুতুল যা হাতে টিপে তৈরী করা হয়, সেইরূপ টেপা পুতুলের আদলের পুতুলও পাওয়া গেছে মহঞ্জোদারোতে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ শিল্পীদের মত নারী শিল্পীরাও হয়ত অবসর সময়ে শিল্প কাজে ব্যাপৃত থাকত। ভাস্কর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্রোঞ্জের দন্ডায়মান নারীমূর্তি ।এক হাত কোমড়ে হাত দিয়ে ভঙ্গিরত, ঠোঁট পুরু, নাক মোটা পিছনে চুল লম্বা খোপা করা

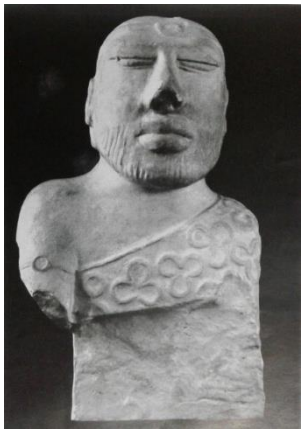

চিত্র.৩,মহেঞ্জোদারোর প্রাপ্ত পাথরের যোগিমূর্তি, আ.৩০০০- ২০০০ খ্রি.পূ.সূত্রঃ এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড আর্ট (৮ম খন্ড)

চিত্র.৪,মহেঞ্জোদারোর প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের নারীমূর্তি,আ. ৩০০০- ২০০০ খ্রি. পূ. সূত্রঃএনসাইক্লোপিডিয়া অব অবওয়ার্ল্ড আর্ট (৮ম খন্ড)

গলায় মাদুলী পড়নে কটি বন্ধ বুকে চোলি হাতে চুড়ি নিয়ে মূর্তিটি দন্ডায়মান(দ্র.চিত্র - ৪)। মূর্তিটি দেখে কোন উচ্চবিত্তের দাসী বলে প্রতীয়মাণ হয়। মূর্তির গড়ন দেখে মনে হয় পেশাদার শিল্পীর করা, অর্থাৎ বর্তমান আধুনিক সভ্যতার মতই সেই যুগে উচ্চকোটি ও নিম্নবিত্তের শিল্পের ছোয়া দেখতে পাই। এ থেকে প্রতিয়মাণ হয় সেই সময় সমাজ জীবনেও শ্রেণীপ্রথা ছিল।হরপ্পার পটারিতে উন্নত চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। প্রাপ্ত পটারির ছবি দেখে মনে হয় পাত্রের গায়ে কয়েকটি প্যানেলে ভাগ করে চিত্র করা। বড় প্যানেলটিতে হরাইজেন্টালভাবে দৃশ্য ভাগ করা। একটি দৃশ্যে দেখা যায় নানান জীবজন্তুর মোটিফ হরিণ, হাঁস, মুরগি, ফুল, সূর্য, মাছ, ধানের শীষ ইত্যাদি। পরবর্তিতে দৃশ্যের ছেদ বর্গাকার জ্যামিতিক নকশা অনেকটা দাবার বোর্ডের মত। এরপর আবার মানুষ জীবজন্তুর পুনরাবৃত্তির নকশা।প্যাটার্নের মত বারবার দৃশ্যের সংযোজন (দ্র.চিত্র-৫)। মহেঞ্জোদারোর প্রাপ্ত চিত্রিত মৃতপাত্রতে মোটা মোটা তুলির আচড় দেখা যায় । হরপ্পার মতই উপরে নীচে প্যানেল করা সবচেয়ে বড় প্যানেলটিতে স্ক্রল করে ছবি আঁকা ফুল লতা পাতার মোটিফ উপরের প্যানেলে জ্যামিতিক নকশা কাটা (দ্র.চিত্র-৬)। খোদাই করা সীলমোহরের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ষাড় ছাড়াও বাঘ, হাতি, গন্ডার, ইত্যাদি পাওয়া গেছে। টেপাপুতুলের মধ্যে দন্ডায়মান, বসা, উপবিষ্ট, শিশুকোলে মা ইত্যাদি ভঙ্গিমারত মার্তৃকামূর্তি পাওয়া গেছে।এখানে উল্লেখ্য যে, হরপ্পা ও মহেঞ্জাদারোর সমগোত্রীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলায় বর্ধমান জেলার অজয় নদ ও কুনুর নদীর অববাহিকায় । পান্ডু রাজার ঢিবি খনন করে মৃৎপাত্রের উপর যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়

কৃষ্ণবর্নের মৃৎপাত্রের উপর কার্ভ ডিজাইন করা অর্থাৎ আচর কাটা।[৩] দুটো কৃষ্ণবর্নের মৃৎপাত্রতে একটিতে দেখা যায় সারিবদ্ধ

চিত্র.৫. হরপ্পা পটারি,নকশা সম্বলিত মানুষ ও জীবজন্তু, আ.৩০০০ থেকে ২০০০ খ্রি.পূ. সূত্রঃ*ভারতের চিত্রকলা(১ম খন্ড)*

চিত্র.৬.মহেঞ্জোদারো পটারি,ফুল,লতাপাতা সম্বলিত চিত্র,আ.৩০০০ থেকে ২০০০ খ্রি.পূ.সূত্রঃ*ভারতের চিত্রকলা(১ম খন্ড)*

মাছ তার পাশে হেচিং করা জালের ছবি অন্যটিতে সারস বা ময়ুর জাতীয় পাখির মুখে সাপ ধরা (দ্র.চিত্র-৭. ৮) ।এতে প্রতীয়মাণ হয়,আবহমান কাল থেকে বাংলায় মানুষজন খাদ্য হিসাবে মাছের উপর নির্ভরশীল ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর পটারির সাথে সমসাময়িক মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।ঐতিহাসিক নিহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সিন্ধু সভ্যতার সাথে পারস্যের মাকরানের খুরাব ও সামারা অঞ্চলের পটারির মিল পাওয়া গেছে এবং বলে থাকেন যে উক্ত সিন্ধু্উপত্যকায় প্রাগৌতিহাসিক সভ্যতার যে পরিচয় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে তা উপরে উল্লেখিত নরগোষ্ঠির সৃষ্টি ।[৪] এই সভ্যতাকে অনেকে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বলে থাকেন। তবে উন্নত নগর দ্রাবিড়েদেরই (মূলত ভাষা) থেকে সৃষ্টি যেমন 'পুর' শব্দটির ব্যবহার দ্রাবিড়দের কাছ থেকে আসা,অর্থাৎ এটি নগরকে নির্দেশ করে পুরজন অর্থ প্রাগ্রসর নগরের অগ্রসর ব্যাক্তি, বর্তমানের পৌরসভার ধারনাটি মনে হয় সেখান থেকেই সৃষ্টি। দ্রাবিড়দের আগে তেমন কোন নগর সভ্যতার পরিচয় না পাওয়া গেলেও অষ্ট্রিক বা নিষাদ জাতির কথা জানা যায় যে তারা নিম্নভূমির কৃষিজীবী মৎসজিবী জাতি, নদী, সমুদ্র, তীরবর্তী বসবাসকারী ।

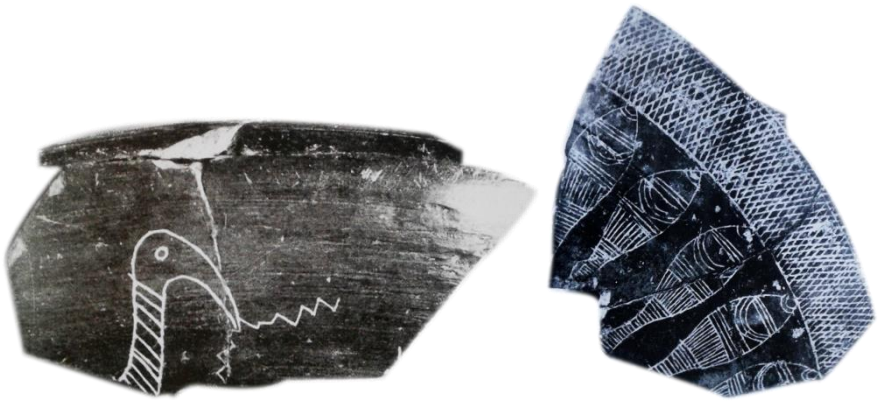

চিত্র .৭,৮ পান্ডুরাজরি ঢিবি কৃষ্ণকায় পটারিতে প্রাপ্ত ময়ুর ও মাছের ছবি,আ.১২০০খ্রি.পূ.
সূত্র:ভারতের চিত্রকলা গ্রন্থ

পরবর্তিতে ঐতিহাসিক যুগে ‘উর’ ‘পুর’ ‘কুট’ ইত্যাদি শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকেই উদ্ভুত বলে প্রতীয়মান হয়। এই সভ্যতার লোকেরা গরুর গাড়ীর ব্যবহার জানত নানা রকম অলংকার পরিধান করত যেমন- সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জ, সীসা,টিনের ব্যবহার জানত, ছোট বড় রাস্তা,পয়-নিষ্কাষণ প্রনালী, বড় ছোট একাধিক তলাবিশিষ্ট ইট কাঠের বাড়ি, দূর্গ, সিড়ি, খিলানযুক্ত দরজা, জানালা, স্নানাগার, কুপ,পূজামন্দির, মৃৎদেহ সৎকারের স্থান নির্মান করেছিলো একটি উন্নত নগর জীবন যাপন করতে যা প্রয়োজন তার সমস্ত কিছুই তারা তৈরী করেছিলো। চিত্রকলায় আমরা পাই জ্যামিতিক রেখাংকন যা নগর তৈরীতে ব্যবহার হয় যেমন ভূমি নকশা তা তারা আয়ত্ত করেছিলো। এই সভ্যতা প্রাকৃতিক কারণে ধ্বংস হওয়ার পর ইতিহাসে বৈদিক যুগের কথা উল্লেখ পাই। এর সময়কাল ধরা হয়েছে আ. ১৫০০ থেকে ৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দ, এটিকে লৌহ যুগও বলা হয়ে থাকে। তখন তারা লোহার তৈরী অস্ত্র ব্যবহার জানত, পোষাক পরিচ্ছদ ছিল উন্নত। সুতিবস্ত্র পরিধান করত। ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই সংস্কৃত ভাষার সাথে পারস্যের জরুস্টাসদের আবেস্ত ভাষার মিল পাওয়া যায় এতে বোঝা যায় আলপা্ইন দিনারিয় কোন শাখা মধ্য এশিয়া হয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করে তারপর তারা ভারতে দ্রাবিড় অষ্ট্রিক ভাষাভাষী লোকদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, ইতিহাসে এদেরকে দাস দস্যু বলে সম্বোধন করতে দেখি। বৈদিক আর্যরা মূর্তি পূজা করত না , হোম যজ্ঞ ছিলো ধর্মের অনুষঙ্গ। সিন্ধু সভ্যতায় আমরা যেমন চিত্রসহ লেখা টেরাকোটার সীলমোহরে পাই। বৈদিক যুগে তেমনটি না পাওয়া গেলেও পুঁথির উদ্ভব হয়েছিলো। আর্যরা ভারতবর্ষে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে

চামড়া, গাছের ছাল, তালপাতা, ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে লেখার প্রচলন শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে এই লেখার সাথে ছবির সংমিশ্রণ হতে দেখি। এই সব উপাদান লিখিত এক একটি গুচ্ছকে বলা হয় পুঁথি।[৫] তবে বৈদিক যুগে শিক্ষার মাধ্যম ছিলো শ্রুতি। অর্থাৎ গুরু যাই বলতেন শিক্ষার্থীরা তাই শুনে মনে রাখতেন। তাই বেদের আরেক নাম শ্রুতি। তবে বৈদিক যুগে চিত্রের চর্চা ছিলো তা স্বীকৃত। চতুর্বেদে ব্রহ্মবিদ্যা, বিজ্ঞান,ইতিহাস প্রভৃতির সাথে কলাবিদ্যা চর্চার কথাও জানা যায়। সেই সময়কার সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

সত্য মিথ্যা যাই হোক সাহিত্য সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি এর মধ্যে ইতিহাস বিদ্যমান বলে মনে করা হয়। রামায়ণ এবং মহাভারতে চিত্রকলার চর্চা ছিলো তার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে উল্লেখ আছে, লঙ্কাতে রাজপ্রাসাদে রাবনের চিত্রশালা ছিলো এবং রাবনের যুদ্ধরথ চিত্রিত ছিলো।[৬]

অনুরূপ মহাভারতে একটি সুন্দর অখ্যান আছে তা হলো :

"রাজকুমারী ঊষা একদিন রাত্রে সুদর্শন এক যুবকের স্বপ্ন দেখিয়া তাহার সহচরী চিত্রলেখাকে স্বপ্নের কথা বলেন। চিত্রলেখা সুনিপুন চিত্রকর ছিলেন। তিনি সকল দেবতা এবং দেশের সকল বিখ্যাত লোকদের আঁকিলেন। ঊষা যে সকল প্রতিকৃতি দেখিয়া স্বপ্নের সুদর্শন যুবকটিকে চিনিতে পারিলেন। তিনি হইলেন অনিরূদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র"।[৭]

এ থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মাণ হয় চিত্রকলার চর্চা তৎকালীন সময়ে ছিলো। তবে সেই সকল চিত্রের নমুনা খুজে পাওয়া ভার। চিত্র সাধারনত আঁকা হতো কাপড়, কাঠ নচেৎ তালপত্রে যা নানান কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এর পরবর্তিতে বৈদিক ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে বেশ কিছু ধর্ম ভারতে আবির্ভূত হয়। যেমন- বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, আজীবক ধর্ম ইত্যাদি। হরপ্পা মহেঞ্জেদারোর মৃৎপাত্রের চিত্রকলায় দেখা যায় সেখানকার অনেক চিত্রকলার উপাদান পরবর্তিতে ভারতীয় চিত্রকলায় অনুপ্রবেশ করেছে। এই অনুপ্রবেশের ধারা উচ্চকোটি লোকায়িত দুই ধারাতেই দেখা যায় তবে বুদ্ধের সময় (বুদ্ধের জন্ম আ.৫৫৬ খ্রি. পূ.) এক ধরনের চিত্র প্রচলন ছিল যা বুদ্ধ তার জীবদ্দশায় 'চরণচিত্র' বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] পরবর্তিতে মৌর্য সম্রাট অশোক (মৌর্য যুগ ৩২২-১৮৫ খ্রি. পূ.) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করে বুদ্ধের অহিংস বানী ভারত থেকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। তিনি বেশ কিছু স্তুপ (বুদ্ধের স্মৃতিস্বরুপ) ,স্তম্ভ, উপাসনাগৃহ, বিহার নির্মান করেন। কথিত আছে তিনি ভারত ও বহির্ভারত মিলিয়ে প্রায় ৮৪০০০ স্তুপ নির্মান করেছিলেন। মৌর্য যুগেই আমরা রাজকীয় শিল্পকলার খোঁজ পাই যা রাজরাজাদের পৃষ্টপোষোকতায় তৈরী যাতে আমরা বহির্ভারতের ছোয়া পাই। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন মৌর্য শিল্পে গ্রীক প্রভাব আছে অর্থাৎ এটি গ্রেকো- ইন্ডিয়ান। গ্রীক

শিল্পের মতই এর চকচকে ভাব সারনাথের স্তম্ভ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে এতে দেখা যায় উল্টানো পদ্মাকার ঘন্টার উপর চাকতি যা সভ্যতার প্রতীক হিসাবে দেয়া। এখানে বুদ্ধের জ্ঞান চক্রকে বোঝানো হয়েছে। এটি সূর্যেরও প্রতীক যার অর্থ জ্ঞান । চাকতির উপর নির্মাণ করা হয়েছে চারটি সিংহ মূর্তি যা অশোকের শক্তি ও বীর্যের প্রতীক হিসাবে দন্ডায়মান। অনেকেই বলে থাকেন এই শিল্পে পারস্যের আকামেনীয় প্রভাব আছে তবে এটি অমূলক নয় যে আলেকজেন্ডারের আক্রমনের ফলে আকামেনীয় রাজধানী পার্সি পোলিস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে গ্রীক ভাস্কর অথবা গ্রীক শিল্পী দ্বারা প্রভাবিত আকামেনীয় শিল্পীরা অশোকের দরবারে সম্ভবত আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় ঐতিহাসিক মেগাস্থিনাসের বর্ণনাতেও পাওয়া যায় অশোকের নগরীর বিরাটত্ব যা পারস্যের সুসা থেকেও জাকজমকপূর্ন ছিল। অর্থাৎ অশোকের দরবারে বাইরের শিল্পী থাকা স্বাভাবিক। আর একটি বিখ্যাত দিক হচ্ছে মসৃনতা যা শিল্পকলার ইতিহাসে মৌর্য পালিশ (Mauryan polish) নামে বিখ্যাত। এ ধরনের পালিশ মৌর্য যুগের পর আর তেমন দেখা যায় না। মৌর্য যুগের বিখ্যাত ভাস্কর্য যক্ষ-যক্ষীর মূর্তি । পাটনার দিদারগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত মৌর্য যুগের কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ থাকলেও এর কারুকাজ, মসৃনতা দেখে একে মৌর্য যুগেরই অখ্যায়িত করা হয়। মৌর্য পরবর্তী বেশ কিছু পরাক্রমশালী রাজ-বংশের নাম পাওয়া যায় । যেমন- সুঙ্গ, অন্ধ্র, কুশান, (আ. খ্রি.পূ. দ্বিতীয় শতক থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়/ তৃতীয় শতক) এই সময়কার স্তুপ তোরনে বেশ কিছু রিলিফ ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায় যা পরবর্তী ভারতীয় চিত্রকলায় বেশ প্রভাব বিস্তার করে। রিলিফ ভাস্কর্যে এক ধরনের পেইন্টিং এর আমেজ পাওয়া যায়। খুব ভাল করে দেখলে এই রিলিফ ভাস্কর্যকে ত্রিমাত্রিক পেইন্টিং মনে হয়। উদাহরনস্বরূপ ভারুত স্তুপের কথা বলা যেতে পারে যা এলাহবাদের একশত মাইল দক্ষিন-পশ্চিমে অবস্থিত (১৮৭৩ সালে স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম কর্তৃক আবিস্কৃত)।[৯] এখানে বুদ্ধের জাতক কাহিনী যা প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারুত আমরবতী, সাঁচির ভাস্কর্যের সাথে অজন্তার চিত্রশালার বেশ মিল পাওয়া যায় যা শ্রীযুক্ত সি শিবরামমূর্তি তাঁর ‘আমরাতী স্কাল্পচার ইন দা মাদ্রাজ গভর্মেন্ট মিউজিয়াম’ (মাদ্রাজ, ১৯৪২) শীর্ষক গ্রন্থে রেখাচিত্র সাজিয়ে পরিস্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন বসন-ভূষন, মুকুট, পাগড়ি, অঙ্গভঙ্গি শরীরের গড়ন, ভাবভঙ্গিতে অজন্তার ছবির সঙ্গে বিশেষ করে নারীদের প্রচুর মিল ।[১০] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভারুতে বুদ্ধকে অতীতের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে যেমন- বোধীবৃক্ষ, ছত্র, ধর্মচক্র, পদচিহ্ন ইত্যাদি। ভারুতে জন্তু জানোয়ারের রিলিফ খুবই উন্নত। আমরাবতীতেও বুদ্ধের কোন ইমেজ পাওয়া যায়না। অন্ধ্রযুগের

(খ্রি.পূ. ২য় শতাব্দী) বিখ্যাত তোরণে বুদ্ধকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করতে দেখা যায় ছাতা, শূন্য সিংহাসন ইত্যাদির মাধ্যমে।

এরপর কুশান যুগে (আ.৫০-২৪১ খ্রি.) বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মানের খবর পাওয়া যায়। সম্ভবত গান্ধারে এবং মথুরায় বুদ্ধদেবের প্রথম মূর্তি হয়েছিল । [১১] মূর্তিতে উত্তর ভারতীয় চেহারার বেশ মিল পাওয়া যায়। গান্ধারে নির্মিত বুদ্ধের চেহারায় নাক, মুখ, চোখে গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান, গ্রীকদের মতই বুদ্ধের পোষাক ভাজ করা চাদরে ঢাকা।

তবে বুদ্ধ তাঁর মূর্তি হোক তা তিনি চাননি। তাঁর মূর্তি নির্মানে তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে শোনা যায়, বুদ্ধের মূর্তি প্রথম তৈরী করেছিলেন কোশল রাজ প্রসেনজিৎ। ভারুত, সাঁচিতে যেমন বুদ্ধের উপস্থিতি প্রতীকের মাধ্যমে দেখি। কুশান যুগে গান্ধার মথুরাতে বুদ্ধের মূর্তির ব্যাপক প্রচলন দেখি। কুশান যুগের সম্রাট কনিস্কের সময় তার হাতে সিল্করোডের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। এই সময় বুদ্ধের মূর্তি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে বর্তমান সময়ে দেবদেবীর যে গড়ন (Iconography) দেখি তা মনে করা হয় এই গান্ধার এবং মথুরার মূর্তির মিলিত প্রতিফলন। এই মূর্তিকলার অবয়বই আমরা পরবর্তিতে ভারতীয় চিত্রকলায় ফুঠে উঠতে দেখি। অবনির্মিলীত চোখ, মরাল গ্রীবা, হাত পায়ের নানান ভঙ্গি, দেহের ত্রিভঙ্গ গঠন ইত্যাদি পরবর্তিতে চিত্রকলায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায় (দ্র.চিত্র-০৯)।

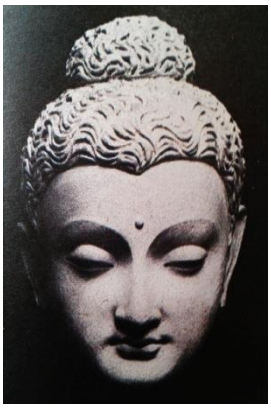

চিত্র-০৯, বুদ্ধ মূর্তি,গান্ধার,সূত্র:শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য গ্রন্থ

ভারতীয় চিত্রকলার মূল বুনিয়াদ পাওয়া যায় অজন্তা গুহাচিত্রে। এর আগে যোগিমারা গুহার চিত্রকলারও কিছু খোদাই, রিলিফের সন্ধান পাওয়া যায় তা ছিল স্বল্পমাত্রার ।মূলত, অজন্তার মত এত ব্যাপক শিল্পের কর্মযজ্ঞ শুধু ভারতে কেন বিশ্বে বিরল। অজন্তা যেন চিত্রকলা , ভাস্কর্য, স্থাপত্যের এক মিলন কেন্দ্র । মহারাষ্ট্রের আত্তরঙ্গবাদে এটি অবস্থিত। এখানে ২৯ টি গুহায় চিত্রকলার সন্ধান পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে গুহাগুলি খোদাই কাজ চলে শেষ হয় খ্রিস্টীয় সাত শতকের দিকে। মনে করা হয়, অজন্তার গুহার গায়ে ছবি আঁকা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকেই শুরু হয়।অজন্তার ছবি প্রায় সাতশত বছর ধরে আঁকা। বেশিরভাগ ছবি বুদ্ধের জাতক কাহিনী নিয়ে আঁকা এছাড়াও তৎকালীন সমাজ জীবন, জীবজন্তু , উদ্ভিদের নানান রকম মোটিকের অলংকরন দেখা যায়। অজন্তার চিত্রগুলিকে বলা হয় ভিত্তিচিত্র বা দেয়াল চিত্র। ইংরেজিতে বলা হয় 'ফ্রেস্কো' (fresco) মূলত ইটালিয়ান শব্দ, ফ্রেস্কো এসেছে ইংরেজি 'ফ্রেশ' শব্দ থেকে অর্থাৎ তাজা বোঝানো হয়েছে। এই ফ্রেস্কো আবার দুই ধরনের ।যেমন- (ক) ফ্রেস্কো সেকো (fresco secco), (খ) ফ্রেস্কো বুনো (fresco buno)। অনেকে মনে করেন ইজেল পেইন্টিং বা তৈলচিত্র এখান থেকে উৎপত্তি।তবে অজন্তার গুহাচিত্রে এই দুই ধরনের ফ্রেস্কোই দেখা যায়। ভিত্তিচিত্র তৈরী করতে পাথুরে দেয়াল গুলিকে মসৃন করে ছবি আঁকার উপযোগী করে তৈরী করা হতো। জমিন মসৃন করে এতে কাদামাটি, গোবর,খড় ও পশুর লোম মিশিয়ে একটি আস্তরন তৈরী করা হতো। এটি ০.৫ থেকে ১.৫০ পযর্ন্ত পুরু হতো। এরপর চুনের প্রলেপ দেওয়া হতো। ভিত্তিচিত্রে (wall painting) খুব বেশি রং এর কাজ করার সুযোগ নেই। তাই এখানে কয়েকটি রং দেখা যায় যেমন- লাল, বাদামি কয়েক প্রকার, ফিকে সবুজ অথবা টেরাভার্ট, নীল আলট্রা মেরিন লাপিসলাজুলি পাথর গুড়া করে এই রং প্রস্তুত করা হতো। প্রথমে চুনের সাদা আস্তরনের উপর লাল রং (গিরিমাটি বা ইন্ডিয়ান রেড) দিয়ে প্রাথমিক রেখা দেওয়া হতো। তারপর সবুজ রং এর (টেরাভার্ট বা সবুজ পাথর) পাতলা শেড দেওয়া হতো,পরে আসত বর্ন সংযোজন। সর্বশেষে বাদামি অথবা কালো রং এর বহিরেখা (outline)এবং শেডিং দেওয়া হতো। অজন্তার চিত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রেখার গতিশীলতা। লেডি হ্যারিংহাম অজন্তার চিত্র সমন্ধে লিখেছেন :

"শেষ পর্যায়ের বহিরেখা দৃঢ় , পরিবর্তিত (modulated)এবং সাদৃশ্যাত্মক। চীনা এবং জাপানী ক্যালিগ্রাফিক গতিশীল বক্ররেখার মতো নহে। মোটের উপর মধ্য যুগের ইটালির ড্রইংয়ের ন্যায়। শিল্পীর দেহের ভঙ্গির উপর দখল আছে। তাহাদের টাইপ, স্থিতি হাতের ভাবভঙ্গি এবং সৌন্দর্য আশ্চর্যজনক, বিভিন্ন জাতির টাইপের সমাবেশ আছে, চেহারা যত্নপূর্বক অনুশীলন করা এবং তাহার মধ্যে সৎকুলজাতের লক্ষন আছে। বলা যায়, ইহার মধ্যে

বিশেষ আদর্শ (stylistic breeding) রহিয়াছে। কোনো চিত্রে গতিশীলতার ব্যঞ্জনা আছে। বিভিন্ন প্রকারের বর্নসমাবেশ চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক। চিত্র স্বর্গীয় হইতে বিকটাকার আছে কমনীয় ও লাবন্যযুক্ত হইতে রুক্ষ ও স্থুল পর্যায়ের আছে। কিন্তু অধিকাংশেরই প্রবল ভাবানুরাগ আছে। ইহার মধ্যে যে অংকন শৈলী তাহা হালকা মিডিয়ামে অংকন করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নয় "। [১২]

অজন্তার চিত্র শুধু ভারতে নয় বিভিন্ন জায়গায় এর চিত্রের টাইপে অনুকৃত হতে দেখা যায় সিংহলে শ্রীগিরিয়া থেকে চীনের টুন হুয়াং (হাজার বুদ্ধেরগুহা),কুচ,খোটানের ফ্রেস্কোতেও অজন্তার চিত্রের অনুপ্রবেশ দেখা যায়। বিভিন্ন রাজার শাসনামলে এর চিত্র অনুকৃত হতে দেখি অন্ধ্র থেকে গুপ্ত পরবর্তি বকাতক রাজার সময়ও এর শিল্পচর্চা চলে। তবে সবথেকে গুপ্ত সময়ই(৩২০-৫৪৪ খ্রি.)এটি ক্লাসিক্যাল যুগ হিসেবে অখ্যায়িত হয়ে থাকে। এই সময়েই কালিদাস, বাৎসায়ন প্রমুখ পন্ডিতদের খবর পাওয়া যায়। বাৎসায়ন রচিত প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ 'কামসুত্র' যা ৩য় শতাব্দীতে রচিত যা থেকে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন তথ্য পাওয়া যায়। যশোধর কামসূত্রের টিকা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করেন যা ভারতীয় চিত্রে ষড়ঙ্গ (Six Principles of Art) হিসাবে খ্যাত। এটি হলো :

" রুপভেদ প্রমাণানি ভাব লাবণ্যযোজনম্
সাদৃশ্যং বণির্কাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্ " [১৩]

এখানে চিত্রের ৬টি ণীতি বা basic principles এর কথা বলা হয়েছে যা পরবর্তিতে ভারতে চিত্রের ব্যাকরণ হিসাবে ব্যাবহৃত হয়েছে ।উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, প্রাগৌতিহাসিক যুগ থেকে প্রাচীন যুগের চিত্রকলার গতিপ্রকৃতি ।মূলত প্রাচীন যুগেই ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষতা দেখা যায়। অজন্তা চিত্রের প্রভাব পরবর্তি সময়ে আশেপাশের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীলংকার শ্রীগিরিয়া থেকে শুরু করে চীনের দন্ডন উলিখ, খোটানের তারিম বেসিন উপত্যকার কিজিল গুহা ইত্যাদি সর্বত্রই অজন্তা চিত্রের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ভারতীয় চিত্রে অজন্তার যে প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায় তা পরবর্তি অধ্যায় আলোচিত হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১ V.S.Wakenker, ***The Dawn of Indian Art***, Ujjain: Kothari Printers,1978, P.5

২ ।তোফায়েল আহমেদ, ***লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত***, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯,পৃ ৮৮

৩ ।Paresh Chandra Gupta , ***The Exavation of Pandu Rajar Dhivi***,Kolkata:Directorate of Archeology West, Bengal,2017,P.11

৪ ।নীহাররঞ্জন রায়,***বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),***কলকাতা:দে'জ পাবলিশিং,২০০৭ ,পৃ ৩২

৫.স্বাতী দাস সরকার, ***বাংলার পুথি বাংলার সংস্কৃতি,*** ঢাকা: সাহিত্য লোক, ১৯৯৮, পৃ ১১

৬. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত,***শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত***,কলকাতা:আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১,পৃ ৬৭

৭.মণীণ্দ্রভূষণ গুপ্ত , প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

৮.রফিকুল আলম, ***উপমহাদেশের শিল্পকলা***,ঢাকা:মাওলা ব্রদার্স,২০১৫,পৃ ২৫

৯. রফিকুল আলম, প্রাগুক্ত,পৃ ৩৭

১০.অশোক মিত্র, ***ভারতের চিত্রকলা(প্রথম খন্ড),***কলকাতা:আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,২০১২,পৃ৪৯

১১.প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত,***ভারতে মন্দির ভাস্কর্যে সমাজ ও সংসার***,কলকাতা:পত্রলেখা,জানুয়ারী ২০১৬,পৃ১৫

১২ ।মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত , পৃ ৭৭

১৩ ।রফিকুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫

দ্বিতীয় আধ্যায়

২. প্রাচীন ভারত ও মধ্যযুগীয় ভারতের অমুসলীম চিত্রকলা

প্রাচীন ভারতের চিত্রকলার উৎকর্ষতা অজন্তা গুহাচিত্রকলাতেই দেখতে পাওয়া যায় এবং এটি চিত্রকলার জগতে মূল সূত্র (original source) হিসাবে আলোচনা সাপেক্ষ পরবর্তিতে ভারতীয় চিত্রকলার নানাবিধ ধারার মধ্যে এর মিশ্রণ দেখা যায়। এটি বৌদ্ধ শিল্পীদের দ্বারা রচিত এবং মার্গীয় শিল্পকলা হিসাবে স্বীকৃত। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক থেকে সাত শতক প্রায় মধ্য যুগের শুরু পর্যন্ত সাত আট বৎসর ব্যাপি এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চলে। এর ভিত্তিচিত্রের কিছু বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা বা দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারা যায় এই গুহাচিত্রকলা কিভাবে পরবর্তিতে ভারতীয় চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় চিত্রকলার অলংকারিক বিন্যাস ও আখ্যানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। যদিও এই ডেকোরেটিভ স্টাইলের কিছু দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সাঁচি,ভারুত ও আমরাবতির রিলিফে লক্ষ্য করা যায়। কানেক্টিং লিংক কম্পোজিশান এটি সাধারণত কাহিনী চিত্রায়িত করতে গেলে খুব দরকার পড়ে। আর অজন্তায় সমস্ত গুহাচিত্রটিকেই ধরা হয়েছে একটি ক্যানভাস বা মহাকাব্য যার মধ্যে ঘটনা অনুঘটনা বিরাজমান। সেখানে কানেক্টিং লিংক করা হয়েছে একটি ফিগারের সাথে অন্য ফিগার দিয়ে হঠাৎ একটি ফিগার বড় করে দিয়ে তার সাথে অন্য ফিগার জুড়ে আবার কখনও দুটি কাহিনীর মধ্যে একটি গাছ বড় করে এঁকে কাহিনী জুড়ে দেয়া হয়েছে। আবার কখনও উদ্ভিদের ডিজাইন দিয়ে অখ্যান থেকে অখ্যানে পাড়ি দেয়া হয়েছে । অজন্তা চিত্রে দেখা যায় প্রধান ব্যাক্তি বা রাজন্যবর্গকে বড় করে দেখানো হয়েছে যা প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলায় দেখা যায়। পরবর্তিতে ভারতীয় চিত্রকলায় এর প্রভাব দেখা যায় সম্রাট, বাদশাহদের অবয়ব বড় করে এঁকে বা রং করে চিহ্নিত করণ হয়েছে। পন্ডিত শিল্প সমালোচকগন বলে থাকেন অজন্তা চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের অভাব। প্ররিপ্রেক্ষিত হচ্ছে চিত্রের একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোণ । অজন্তা চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত এসেছে ভিন্নভাবে একই ছবিতে কখনও উপর থেকে কখনও নীচ থেকে, কখনও সম্মুখ বা সোজাসুজি এই তিনটি দিক একত্রে সমন্বয় করে আঁকা হয়েছে (দ্র.চিত্র-১০)। ছবিটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাড়ির বারান্দায় ডান পাশে দুটো মানুষ আলাপচারিতায় মগ্ন, তাকে দেখানো হয়েছে নীচ থেকে আবার বাম পাশে অনেকগুলো মানুষ দেখানো হয়েছে উপরে থেকে আবার ডানপাশে উপরে, দুটো মানুষ স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় দেখানো হয়েছে। এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার পরিপ্রেক্ষিত দিয়ে বিভ্রম ঘটানো হয়েছে। ছাদ, বারান্দা, মাটিতে দাঁড়ানো লোক সব একসাথে

দেখানো হয়েছে। একে ‘multiple perspective ’ বা ‘ multivision ’ বাংলায় বহুগুন পরিপ্রেক্ষিত বলা হয়। এর ব্যবহার আমরা পরবতীতে ভারতীয় চিত্রকলার প্রতিফলন হতে দেখি। আবার এই multiple perspective এর চর্চা আমরা পাই বিশ শতকের শুরুতে সেজানের হাত ধরে কিউবিজমে এর প্রকাশ দেখি। এর আগে ইউরোপীয় চিত্রকলায় বিশেষ করে রেঁনেসার সময় বাস্তববাদি পরিপ্রেক্ষিতের চর্চা দেখা যায়।এই মাল্টিভিশন পরিপ্রেক্ষিতের একটি বিশেষ দিক হল দর্শক চারিদিক থেকে ছবিটি অবলোকন করতে পারে। দর্শক চিন্তার খোরাক পায় এবং দৃষ্টির গতি বাড়ে। অজন্তা চিত্রের আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে রোটেশন পার্সপেক্টিভ যা আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, ভাস্কর্য, চিত্রে দেখা যায়। রোটেশন পার্সপেক্টিভ কি ? ধরা যাক একটি দৃশ্যে দুটি বিল্ডিং এর ভ্যানিশিং পয়েন্ট এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে একে one point perspective বলে। অজন্তা চিত্রে বিল্ডিং এর মিলিত বিন্দু ঘুরিয়ে বিপরীত দিকে করা হয়েছে। অজন্তা চিত্রকাররা এই কাজ করেছেন কোন বস্তু সরাসরি দেখে নয় তার মানস চক্ষু নিয়ে মনের ধ্যান থেকে করা অর্থাৎ যা নয় তাই করে দেখানো অনেকটা ম্যাজিকের মত। অজন্তার শিল্পীরা মনে করতেন ছবির মধ্যে স্বর্গীয় আভা থাকবে। শিল্পীরা ঐশি শক্তির বাহক । তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হবে। এ মহিমা পূর্ববর্তি সাঁচি, ভারুত, আমরাবতীর রিলিফ ভাস্কর্যেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

চিত্র- ১০.জাতক কাহিনির দৃশ্যে বিভিন্ন দিকের পরিপ্রেক্ষিতের দৃশ্য,সূত্রঃ*অজন্তা গ্রন্থ*

অনেকে বলে থাকেন দেহের সংস্থান অজন্তার শিল্পীরা জানতেন না। অজন্তার চিত্র দেখলে একথা মনে হয় না। শিল্পীরা দেহের মাপজোক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কোমর থেকে কাঁধ কতটুকু হবে, হাতের কনুই কোথায় পড়বে, হাত কোথায় শেষ হবে, পা কতটুকু হবে তার সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রূপায়িত হতে দেখি। গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ চিত্রের পাশাপাশি হচ্ছে তার সাহিত্য। এ দুটো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। সাহিত্যের

উপমার সাথে চিত্রের মিল পাওয়া যায়। অজন্তা শিল্পীরা মানবদেহের বিভিন্ন প্রটোটাইপ তৈরী করেছিলেন। যেমন- পাখী থেকে, পশু থেকে ফুল লতাপাতা থেকে সাদৃশ্য রচনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ***Some notes on Indian Artistic Anatomy*** গ্রন্থে লিখেছেন:

'' তাহা হতে এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হবে যেমন: চরণ কমল চম্পক আঙ্গুলি, হরিণ নয়ন, সিংহ কটি, কবাটবক্ষ, শুক নাসা যা আদর্শ কালিদাসের, কাব্যেও পাওয়া যাবে।''[১]

অর্থাৎ পা হবে পদ্মের মত, হরিনের মত চোখ, সিংহের মত হবে চিকন কোমর অর্থাৎ সিংহকটি, গরুর মাথার উপরের মতো হবে শরীরের উপরিভাগ অর্থাৎ গোমুখকান্ড এসব উপমার মতো ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে (দ্র.চিত্র- **১১**)। ঠিক অনুরুপ ড্রইং এর ষ্টাইল ভারতীয় ছবির পরবর্তীতে দিক নিদর্শন হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অজন্তা চিত্রে মানুষই প্রধান উপজিব্য তাই তাকে কেন্দ্র করে পশুপাখি, লতাগুলম, অট্রালিকা বহমান কোথাও এতটুকু

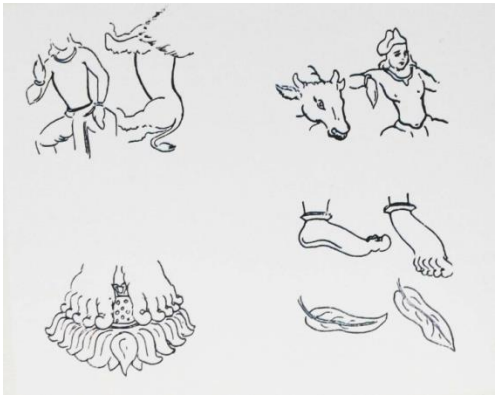

চিত্র-**১১** , অজন্তায় প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের মতো করে দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ আঁকা হয়েছে,সূত্র:*অজন্তা গ্রন্থ*

স্পেস নেই। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভরা প্রাণের মত। অজন্তা চিত্রে হৃদৃশ্য সম্বিলিত অট্রালিকা এর দেখা পাই যা পরবর্তিতে মূঘল যুগের চিত্রেও দেখা যায়। অজন্তার দেয়াল, ফ্রিজে ও ছাদের নীচে পদ্মলতা আছে বৃত্তের ভিতরে যা বাংলার পটচিত্রে, যাত্রাকলসের আলপনাতে দেখা যায়। অজন্তা চিত্রে নারী নানারকম মহিমায় উদ্ভাসিত তেমনি পশু পাখি চিত্রণেও অজন্তা শিল্পীরা উৎকর্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। জাতকের চিত্রে পশুপাখিরা মানুষের মতই সরস। শিকারের দৃশ্যে হাতিকে মনরোমভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। হাতি রাজ শক্তির প্রতীক। ভারতের রাজমহিমা প্রকাশ হয় হাতি দিয়ে। অজন্তা থেকে শুরু করে মুঘল যুগ পর্যন্ত নানা ভাবে হাতিকে উপস্থাপন করতে দেখি। ভারতীয় শিল্পীদের মত হাতি অংকনের দক্ষতা পৃথিবীর অন্যকোন চিত্রে দেখা যায় না। ।তেমনি পশুপখির মুরালের মধ্যে ষাড়ের লড়াইয়ের দৃশ্য অনন্য

সাধারন। দুটি ষাড়ের লড়াইয়ে দৃশ্যে ষাড়ের লড়াইয়ের ভঙ্গিএবং ক্ষিপ্রতা দারূনভাবে অজন্তা শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন (দ্র.চিত্র-১২) ।ভারতীয় চিত্রেরে অলংকারের যে মোটিফ তা জগৎবিখ্যাত। প্রকৃতি থেকে ফুল- লতাপাতা, উদ্ভিদ ,পশুপাখি ইত্যাদির ইমেজ নিয়ে চমৎকার মোটিফ তৈরী হতে দেখা যায়। পূর্বে হরপ্পা মহেঞ্জাদরো থেকে ভারুত, সাঁচি, আমরাবতীর কাজে ফুল লতাপাতার অলংকার (floral motif) তারই প্রতিফলিতরূপ অজন্তাতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় ।তবে অনেকেই অজন্তা চিত্রকে primitive, unsophisticated বলেছেন ।তার বিরুদ্ধে ড. কুমার স্বামীর মত দিয়েছেন :

"A more conscious or indeed more sophisticated art could scarcely be imagined. Despite its invariably religious subject matter, this is an art of great court charming the mind by their noble routine"

অর্থাৎ ''এরূপ সজ্ঞান এবং মিশ্রিত কুটতর্ক সমন্নিত (sophisticated) চিত্রের ন্যায় আর কল্পনা করা যায় না যদিও ইহার অংকিত চিত্র সবই ধর্ম বিষয়ক, ইহা হইল দরবার চিত্র, যাহা তাহার দৈনন্দিন কর্ম দ্বারা মনকে মুগ্ধ করে।''[২]

অজন্তা চিত্রের এ বিশাল ভান্ডারে ধর্ম বিষয়ক চিত্র যেমন ছিল তেমনি তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবিও পাওয়া যায় যেমন-মাতাল থেকে নর্তকী, দরবার থেকের মেঠোপথ, বিদেশি অতিথি রাজা এ সকলেই এখানে বিদ্যমান ছিল।

চিত্র-১২, ষাড়ের লড়াই,অজন্তার মুরালচিত্র,সূত্র:*অজন্তা*

২.১ পাল আমলের পুঁথি চিত্রকলা

গুপ্ত সম্রাজ্যের পতনের পর, পাল যুগ (আ.৭৫০-১১৬২ খ্রি.) শুরু হয়। গুপ্ত পরবর্তী তেমন শক্তিশালী সম্রাজ্যের উত্থান পাওয়া না গেলেও তবে অষ্টম শতকে পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বিহার ও বঙ্গে গোপাল

নামক নৃপতির সিংহাসনের আরোহণের মধ্য দিয়ে পাল বংশের শুরু।তবে ধর্ম পালের সময় (আ.৮১০-৮৪৭খ্রি.)এর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।ক্রমান্বয়ে পাল আমলের প্রতিপত্তি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় ভাস্কর্যের সাথে চিত্রকলার চর্চারও প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়। পাল রাজবংশে বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যায় ।তাদের স্বকীয় চিত্রকলা ছিল।

পাল আমলের যেটুকু চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায় এর মধ্যে 'অষ্ট সহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'(perfect wisdom in eight thousend verses)ও 'পঞ্চরক্ষা' (five protective goddess) (যা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে রক্ষিত) এছাড়াও 'ধরনীগ্রন্থ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি একাদশ শতাব্দির দ্বিতীয়টি মাঝামাঝি। ছবির বিষয় হচ্ছে বুদ্ধের জীবনী ও বিভিন্ন তান্ত্রিক দেবদেবীর আইকোনোগ্রাফিক উপস্থাপনা ।এসব পুঁথিতে সংস্কৃত লিপি দেখা যায় এবং আইকনগ্রাফিক হওয়াতে পড়ার চেয়ে পুজিত বস্তু হিসাবেই গন্য হত বেশী ।এসব পুথি জৈবিক রং দিয়ে চিত্রিত হত । উচ্চ মার্গীয় শিল্প বিশেষ করে অজন্তা ইলোরার বৈশিষ্ঠের প্রভাব দেখা যায় (দ্র.চিত্র-১৩)।

অজন্তার গুহাচিত্র যা মার্গরিতী বা ক্লাসিক্যাল রিতী হিসাবে স্বীকৃত যা সাত শতকের আগে রচিত। যেখানে বুদ্ধের জাতকের কাহিনী এবং চিত্রে অন্যান্য তৎকালীন বিষয় দেখি কানেক্টিং লিংক, মাল্টি ভিশান, রোটেশন পার্সপোক্টিভ যা দর্শককে টানটান উত্তেজনার একটি ঘোরের মধ্যে রাখে। কিন্তু দশম শতকে এসে পাল পুথিচিত্রে এবং সমসাময়িক নেপাল এবং মায়ানমারের পুঁথিচিত্রে দেখা যায় স্থবির এবং ভাস্কর্যের ভরের গুনের বৈশিষ্ট্য। এর একটি বিশেষ কারণ হতে পারে অনেকেই বলে থাকেন পাল যুগে চিত্রকর ভাস্কর একই ব্যাক্তি দ্বারা রচিত হয়েছে চিত্রের মধ্যে ভাস্কর্যের গুনাগুন বিদ্যমান। এটি অমুলক কিছু নয় ইতালির রেনেসাঁসের সময় আমরা দেখি শিল্পীদের নানা কর্মকান্ডে ব্যস্ত হতে। ইউরোপেও এই পুঁথিচিত্রণ দেখা যায় কখনও লম্বাটে বা দিগন্তরেখা ভিত্তিক। অনেক সময় পুঁথিতে ভুল হলে দেখা যায় সেখানে চিত্র এঁকে দিতে।ঐতিহাসিক লামা

চিত্র- ১৩, পাল পুথিচিত্র পঞ্চরক্ষা (বুদ্ধধর্মের রক্ষা দেবী),১০৪০ খ্রি.
সূত্র: বাংলার প্রাথিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

তারনাথের সাক্ষ্য মতে পাল যুগে দুজন শিলপীর নাম পাওয়া যায় যেমন- ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল নামে। পিতা ধীমানের রিতীটি ছিল পূর্ব দেশীয় আর পুত্রের রিতীটি ছিল মধ্য দেশীয় (মগধ ও দক্ষিণ বিহার) ।[৩] এঁরা একসথে ভাস্কর্য শিল্পী ও চিত্রকরও ছিলেন ।

পূর্ববর্তী অজন্তা চিত্রের দর্শন উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি বানিজ্যের বন্দর বা পথের দার হিসাবে ব্যবহার হতে। পথিককে বা বনিককে দুদন্ড শান্তি, মনকে বিনোদনের খোরাক ও বৌদ্ধ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা ছিল উদ্দেশ্য। অপরদিকে পাল আমলে এসে আমরা পুথিতে পাই নিরক্ষর অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের লোকদের ধর্মে আকৃষ্ট করার প্রবনতা। অজন্তার মত পাল আমলেও বৌদ্ধকেন্দ্রিক বিষয় দেখা যায়।তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর আলেখ্য দেখা যায় বেশি।দেবদেবীর মধ্যে দেখা যায় প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা,লোকনাথ, মৈত্রেয়,মহাকাল,বজ্রপাণী, বসুধারা, কুরুকুল্লা, চুন্দা,বজ্রসত্ব,মঞ্জুঘোষ ইত্যাদি।তাদের বৈভব ও কীর্তিগাথার, পরিচয় বিধৃত বেশি মাত্রায় । অজন্তা চিত্রকলাতে যেমন ছায়া, শেডিং, স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতে ইত্যাদির অভাব দেখি ঠিক তদ্রুপ এখানেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা নীহাররঞ্জন রায় অজন্তার প্রাচীরচিত্রের সঙ্গে পাল পুথিচিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলেছেন:

‘‘স্বল্পায়তন পান্ডুলিপি- চিত্রের যাহা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ঠ, অর্থাৎ সুক্ষ রেখার ধীর অথচ তীক্ষ্ণগতি, সুক্ষ্ম ও ঘন কারুকার্য , বিন্যাসের ঘনত্ব ও গভীর ভাবনা- কল্পনার অনুপস্থিতি প্রভৃতি এই পান্ডুলিপি-চিত্রগুলিতে নাই। সেই জন্যই ইংরেজিতে miniature বলিতে যাহা আমরা বুঝি এই পান্ডুলিপি-চিত্রগুলিতে সেই সব বস্তু নয় । আয়তন

ক্ষুদ্র হওয়া সত্বেও এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলির ভাবনা-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত ও গভীর ,পরিকলপনা বৃহৎ রেখার ডৌল ও বিস্তার দীর্ঘায়ত। রঙের বিন্যাস মন্ডন প্রশস্থায়িত। এই দীর্ঘ, প্রশস্ত ও বৃহৎ বিস্তার একান্তই বৃহদায়তন প্রাচীর-চিত্রের । প্রাচীর-চিত্রে লক্ষণই এই পাণ্ডুলিপি-চিত্রগুলিরও লক্ষণ;প্রাচীর-চিত্রই যেন পাণ্ডুলিপি-পত্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বল্পায়তনে অঙ্কিত।"[৪]

এ থেকে স্পষ্ঠ প্রমাণীত হয় যে, পাল পুঁথি চিত্রে অজন্তার প্রভাব বিদ্যমান ছিল পুথিচিত্রের বিষয় রচিত হয়েছে বুদ্ধের জীবনের আটটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পুঁথিতে আমরা ইমেজ এবং টেকষ্টের দারুন সমন্বয় দেখি ডানে ও বাঁয়ে টেকস্ট বা অক্ষর বিন্যাস করে ইমেজ বা ছবি আঁকা হত আবার উল্টো দুই পাশে ছবি ব্যাবহার করে মাঝখানে অক্ষর বিন্যাস হত। এই পুথিগুলো লেখা হত সাধারণত তালপাতার উপর। দুই প্রকার তালপাতা দেখা যায়। যেমন: ১। খড় তাড় , ২। শ্রী তাড়। নেপালী ভূর্জপত্র থেকে তৈরী এক ধরনের তুলোট কাগজ হতো যাকে তেরেট পাতা বলা হতো। পূর্বেকার তেরেট পাতাই পুঁথির কাগজ হিসাবে ব্যাবহৃত হত বেশি।পুথিগুলো দৈর্ঘ্যে ৯ সে.মি.এবং প্রস্থে ২.৫ সে.মি.হত। পুঁথিচিত্রে রেখার প্রাধান্য (linear effect) বেশি দেখা যায় এর কারণ হতে পারে তালপাতায় তুলি চালনা ছিল কষ্টকর। অপরদিকে অজন্তা গুহাটিতে ফ্রেস্কোর জমি ভালভাবে হওয়াতে তুলি চালনা ছিল সহজ।

২.২ জৈন চিত্রকলা বা পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলা

পশ্চিম ভারতের জৈন চিত্রকলার (আ. ৭০০-১৮০০ খ্রি.) সূত্রপাত শুরু হয় ষোল শতকের দিকে। এর প্রসার ও বিকাশ ঘটে মূলত বিত্তশালী জৈন ধর্মালম্বীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এর প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল আহমেদাবাদের শ্রী পাটান নামক জায়গায়। এছাড়াও উত্তর পশ্চিম ভারতের রাজপুতানা, গুজরাট জয়সলমির আহমেদাবাদ, প্রভৃতি অঞ্চলে জৈনদের একাধিক মন্দির ও বিহার ছিল। জৈনদের বিহারকে উপাশ্রয় বলা হয়। এখানে পুঁথি অনুকরণ ও লেখা সংগৃহিত হত। প্রথম জৈন পুঁথিচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় 'জ্ঞাতাসূত্রে' যাতে আম্বিকা দেবীর চিত্র সম্বলিত ছিল। পরবর্তীতে 'কল্পসূত্র' নামে পুঁথিচিত্রের সন্ধান পাই যাতে মহাবীর ও জৈন তীর্থংকরদের জীবন চরিত্র বিধৃত ছিল। 'কালিকার্য কথা' নামে আরেকটি পুঁথি পাওয়া যায়। এর মধ্যে সাধু কালিকা ও দুষ্টরাজা গর্দাভিন্নার কাহিনী বিধৃত ছিল। পন্ডিতরা মনে করেন মধ্যযুগে পুথিচিত্রের সবথেকে বড় ঘাটি ছিল গুজরাট এবং পরে দ্বিতীয় ঘাটি হিসাবে মালোয়ার মান্ডুর নাম শোনা যায়। পশ্চিম ভারতের পুঁথির উৎকর্ষতা পাওয়া যায় 'কল্পসূত্রে' আবার মান্ডুতে পাওযা যায় 'কালিকার্য কথা' নামক পুঁথির উৎকর্ষতা। পশ্চিম ভারতে পনের শতকের দিকে পুঁথির চর্চা খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় এর

দুটো কারণ হতে পারে একটি হল জৈনধর্মালম্বীরা ব্যাংকিং কাজে লিপ্ত থাকায় তাদের বিলাস বা গৌরবের বস্তু হয়ে দারায় এই পুঁথিচিত্র। 'কল্পসূত্র' ও 'কালিকার্যকথা' প্রচুর পরিমাণে নকল হতে থাকে । দ্বিতীয় কারণ মহাবীর ও জৈন তীর্থংকেরদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেও এই পুঁথির চর্চা হয়। তৎকালীন সময় ধর্মপ্রচারকে একটি পুন্যির কাজ বলে মনে করা হত । অনুরূপ প্রাচীন কালেও খ্রীস্টানদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মূর্তিনির্মান দেখা যায়। যেমন- গ্রীসের মন্দিরে বিশেষ করে পার্থেনন ইত্যাদিতে। অতীতে হিন্দু, বৈদ্ধদের মধ্যেও মন্দিরে মূর্তিদান পুন্যির কাজ বলে মনে করা হতো । সেইকারণে প্রচুর মূর্তি নির্মাণ হয়েছে বলে মনে করা হয় ।[৫] পুঁথিতে দেখা যায় সোনা, ইন্দ্রনীল (ল্যাপিজ ল্যাজুলাই) কার্সাইন (রক্তিম রত্ন) ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার । ছবির পাড় হিসেবে চিত্রে দেখা যায় বস্ত্র ও কার্পেটের নানারকম অলংকার। বিষয় হিসাবে সাধারণত দেখা যায় স্থাপত্য, সাধারণ নগর চিত্র,বাগান,নৃত্যরত ও বাদ্যরত ভক্তের দল ,জীবজন্তু ইত্যাদি। অনেকেই বলে থাকেন এটি ইলোরার ভিত্তিচিত্র থেকে উৎসারিত বা ভিত্তিচিত্রের ছোট সংস্করণ। আবার এতে আদিবাসী বা লোকচিত্রের বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান ।জৈন পুথিচিত্রের বিশেষ দিক হল মানুষ আঁকার রীতি এখানে দেখা যায় মহাবীর ও তীর্থংকরদের মুখ আঁকার, সময় এক পাশ ফেরানো সাধারণত দ্বিতীয় চোখটি দেখা যাওয়ার কথা না কিন্তু এখানে দ্বিতীয় চোখটিকে আরোপিত করে দেখানো হয়েছে যেন মনে হচ্ছে চোখটি লেগে আছে বা ঠিকরে বের হচ্ছে(দ্র. চিত্র-১৪) আবার নাকটি ঈগলের মত। এই রীতিটি পরবর্তীতে আমরা ডেকান, বৈষ্ণব ও মূঘল চিত্র ও কিছু প্রভাব বাংলাতেও দখতে পাওয়া যায়।

এই রীতিটি সবথেকে বেশি দেখতে পাই বিশ শতকে ইউরোপে পিকাসোর কাজে। তবে বিশ শতকের শক্তিধর শিল্পী পিকাসো জৈন চিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত তবে শোনা যায় পিকাসো দুর্লভ চিত্র সংগ্রহক ছিলেন আফ্রিকা , ভারতীয় বিভিন্ন দেশের দুষ্প্রাপ্য চিত্র ভাস্কর্য সংগ্রহ করতেন আর শোনা যায় পনের শতকে ইউরোপীয় বনিক মিশনারী ভারতবর্ষে আসতে থাকেন দলে দলে। তাদের হাত দিয়ে জৈন চিত্রকলা ইউরোপে যাওয়া অমুলক কিছু নয়।

চিত্র-১৪, জৈন পুঁথিচিত্র কল্পসূত্র,মহাবীরের জন্ম ,অস্বচ্ছ জলরং, শেষ ১৫শতক -১৬ শতকের প্রথমার্ধ,

সূত্রঃ উইকিপিডিয়া,জৈন মেনুস্ক্রিপ্ট পেইন্টিং,তারিখ২/৭/১৯

২.৩ বৈষ্ণব পুঁথি চিত্রকলা

বৈষ্ণব পুঁথিচিত্রের (আ.দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) উৎকর্ষতা দেখা যায় সুলতানী সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের(১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) মাধ্যমে।যদিও এর আগে ভাস্কর্য ও সাহিত্যে মূলত বৈষ্ণব শিল্পকলার সূত্রপাত। তবে শোনা যায় দশম শতকে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের মন্দির গাত্রের টেরাকোটায় বৈষ্ণব ভাস্কর্যের সূচনা পরিলক্ষিত হয়।পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্ম দার্শনিক ভিত্তি লাভ করে।[৬]চৈতন্যদেবের জন্মভূমি ছিল নবদ্বীপ। আর এখানেই ব্রাহ্মন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চার খবর পাওয়া যায়। সেই সময় গৌড়ের অধিপতি ছিলেন সুলতান হুসেন শাহ (আ.১৪৯৪-১৫১৯ খ্রি.)। হুসেন শাহর দরবারে পারসিক পান্ডুলিপি চিত্রের চর্চার চল ছিল বলে জানা যায়। চতুর্দশ শতকে ফিরোজ শাহ তুঘলক মারা যাওয়ার পর তৈমুর ১৩৯৮ সালে ভারত আক্রমন করলে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন প্রদেশ যেমন- দক্ষিনাত্য, মালব, জৈনপুর ও বাংলার সুলতানরা স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। এই সুলতানদের দরবারে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার পারসিক পান্ডুলিপি চিত্রের অনুকৃতির খবর পাওয়া যায়। তেমনি একটি পুঁথি পান্ডুলিপি চিত্র কবি নিজামি রচিত 'ইস্কান্দর নামা' বা আলেকজান্ডারের কাহিনী ভূক্ত 'শরফনামা' হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের (আ.১৫১৯-১৫৩৩খ্রি.) জন্য জনৈক হামিদ খান অনুকৃতি করেছিলেন।[৭] তৎকালীন সময় চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি বা ভক্তিবাদ কে আশ্রয় করে বৈষ্ণব ধর্মের উৎকর্ষতা দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের নৃত্য গীতের সাথে চিত্রকলা চরিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের

পদচারণার ভূমিতে (বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবন , মথুরা) এই চিত্রকলার চর্চার প্রচলন বেশি দেখা যায়। বৈষ্ণব পুঁথিচিত্রে পুথির বাইন্ডিং বা মলাট হিসাবে এক ধরনের কাঠের উপর ও ভিতরে চিত্রিত বা অলংকরণ আঁকা হয়। একে পাটা বলা হত। এগুলো সাধারণত চড়া রংএর হত।পাটার পুরোটা জুড়েই শিল্পীরা চিত্রিত করত।এগুলি করা হত পুথি সংরক্ষণের জন্য, এরকম কিছু উৎকৃষ্ট পাটা চিত্র দেখা যায় কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে (দ্র.চিত্র-১৫)। প্রাচীন সেলাইবিহীন পুথিকে একত্রে বেঁধে রাখতে এই পাটা ব্যাবহার করা হত।এগুলো শক্ত কাঠ ও চামড়ার হত । শোনা যায় এসব পাটাতে ধুপ-ধুনো, ঘি-চন্দন দিয়ে পূজো-আর্চনার করা হত ফলে অনেক পাটাই নষ্ট হয়ে যায়। পাটার ব্যাবহার ও সচিত্রকরণ সম্পর্কে মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য :

'' আধুনিককালে পুস্তকাকার পান্ডুলিপিতে সেলাইয়ের রেওয়াজ থাকলেও প্রাচীন পান্ডুলিপিতে সেলাই করার রেওয়াজ ছিল না। তাই সেলাই ছাড়া পাতাগুলি যাতে বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো না হয় সে- জন্য কাঠের পাটা দিয়ে পান্ডুলিপিকে সজোরে বেঁধে রাখা হতো । এই সজোরে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্য পান্ডুলিপিতে যাতে বাতাস প্রবেশ না করে। পুথিকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার এটি ছিল একটি উপায় ।'... তাই একটি প্রবাদ আছে : 'পুঁথিকে পুত্রের মত পালবে আর শত্রুর মত বাঁধবে ।'...কাঠের পাটার উপর নানারকমের নকশা, চক্র বা চিত্র অঙ্কিত বা খোদাই করা হতো ।''[৮]

বৈষ্ণব অধ্যুষিত উড়িষ্যাতে জগন্নাথপুরীর মন্দির সংলগ্ন আখড়াগুলিতে ব্যাপক পুঁথি চিত্রের প্রচলন হয় এবং বিভিন্ন মাধ্যম্যে এর চর্চা হতে দেখা যায়। বিশেষ করে কাপড়েও এ চিত্র দেখা যায়। উড়িষ্যাতে কাপড়কে 'পাটা' বলে। কৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে যেমন বৃন্দাবন ও মথুরা বৈষ্ণবদের সর্বোচ্চ তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। সেখানে বৈষ্ণব পুঁথিচিত্র বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমাশ্রিত কাহিনীর চর্চা দেখা যায় বেশী। ফলে এর বিস্তৃতী বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে যেমন হিমাচল, আলোয়ার, কিষনগড়, বুদি, কোটা কাঁকরোলি, যোধপুর, উদয়পুর, দ্বারকা, মনিপুর, আসাম থেকে শ্রীহট্র জেলা পর্যন্ত এই পুঁথির উৎকর্ষতা দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে মুঘল অন্তযুগে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে যে পাহাড়ী চিত্রকলার উদ্ভব হয় তা বৈষ্ণব চিত্রকলার প্রতিফলিত রূপ বলে মনে করা হয় ।

চিত্র-১৫, বৈষ্ণব পাটাচিত্র,রাসলীলা,বাকুরা,১৭শতক,
সূত্র:কলকাতা আশুতোষ মিউজিয়াম

২.৪ ভারতে মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব ও বিকাশ

মুঘল চিত্রকলা এক ধরনের 'ক্ষুদ্র চিত্রকলা' বা 'অণুচিত্র' ইংরেজীতে ' Miniature Painting ' বলে। এই শব্দটি অষ্টাদশ থেকে বেশী মাত্রায় চালু হয়। সাধরণত ক্ষুদ্র ছবি আঁকা হত হাতির দাতে, ধাতু, চাল ইত্যাদিতে। এগুলো নিতান্তই ক্ষুদ্র চিত্র পুঁথি চিত্রের সাথে এর কোনো মিল নেই। তবে অনেকেই বলে থাকেন মিনিয়েচার বা অনুচিত্র এই নামটি পুঁথিচিত্র থেকেই এসেছে। কারণ পুঁথিতে আদি বর্ণটিকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য বড় করে লেখা হতো এবং লাল রং ব্যবহার করা হত একে বলা হত মিনিয়াস।[৯] শুধু ভারতবর্ষে নয় পাশ্চত্য দেশেও মিনিয়েচারের চর্চা হত। তবে এই 'অণুচিত্র' মুঘল দরবারের প্রবেশের পূর্বের ইতিবৃত্ত বিশ্লষণ করলে জানা যায় মধ্যযুগে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের তুলনায় বইয়ের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহ মুসলিম ধর্মীয় অনুসারীদের মধ্যে দেখা যায়। এই সমস্ত ধর্ম বিষয়ক পুথির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লিপিকার এবং চিত্রশিল্পী, দশম শতকে বইয়ের প্রতি মুসলিমদের বেশি মাত্রায় মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। এদিকে অষ্টম শতকে কাগজের আবিষ্কার হয়। নবম শতকে কাগজের কারখানা বিভিন্ন জায়গায় যেমন বোখারা, বাগদাদ, সমরখন্দে স্থাপন করা হয়। মুসলিমদের বইয়ের প্রতি আগ্রহের ফলে খ্যাতিমান লিপিকার বা ক্যালিগ্রাফারকে পবিত্র গ্রন্থ কোরআন এর একটি পাতা লিপিবদ্ধ করতে বিপুল পরিমান দক্ষিনা দেওয়ার রেওয়াজ তখন থেকেই চালু হয়। কালক্রমে আরবি হরফের নানান রুপান্তর ঘটতে থাকে এবং সেই হরফ অলংকারিক চরিত্র অর্জন করে। প্রথম প্রথম ক্যালিগ্রফির সংঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আরবীয় লতাপুস্পের নকশা (floral design) বা উদ্ভিদের ছন্দ (vegetative rhythm) দ্বারা নকশা করা হত ।

পান্ডুলিপির পাতাগুলো কালক্রমে এই আলংকারিক লিপির ছন্দময় রেখা, উজ্জ্বল ও বিভিন্ন রং এর সমাবেশ চিত্রকলাকে একটি অনুকরণীয় এবং বৈশিষ্টপূর্ণ শিল্পিরীতিতে পরিণত করে। এই আলংকারিক শব্দ থেকেই এরাবেস্ক (arabesque) শব্দের উৎপত্তি। খ্রিস্টীয় ৭ম শতকের দিকে মুসলিমদের বিজয় উত্থানের ফলে এই arabesque পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে। এই এরাবেস্ক তৈরী হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ হতে পারে যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে প্রানীর চিত্র নিষিদ্ধ (যদিও পবিত্র গ্রন্থ কোরআনে সুনির্দিষ্টভাবে তা উল্লেখ নেই)।[১০] সেহেতু চিত্র হয়ে উঠে বিমূর্ত ও ডিজাইন নির্ভর।

ইসলাম ধর্ম পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এই arabesque বিভিন্ন জায়গায় মিশ্রন হতে দেখা যায়। যেমন- ইসলামী চিত্রকলার সাথে বাইজান্টাইন,সাসানীয়, ম্যানিকীয় রিতীর সংমিশ্রন হতে দেখা যায়। প্রাক ইসলামী যুগেই পারস্য একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানে বেশ কয়েকটি ধর্মের উদ্ভব হয়।যেমন-জরথ্রুষ্ট, ম্যানিকিয়েন ধর্ম এদের নিজস্ব চিত্রকলা ছিল। মনিষীদের মস্তকের পেছনে সূর্য গোলক যা মুঘল চিত্রকলায় দেখা যায় তা অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন জরথ্রুষ্টদের কাছ থেকে বাইজান্টাইন শিল্পীদের কাছে যায় এবং সেখান থেকে মুঘল চিত্রকলায় ফিরে আসে আবার কুন্ডলীকৃত মেঘ যা মূঘল চিত্রে দেখা যায় সেটিও অনেকে মনে করেন ম্যানিকিয়ান ধর্মের চিত্রকলা থেকে উদ্ভুত ।[১১]

এই পারস্য মুসলিম অধিকার আসলে আব্বাসীয়দের দ্বারা পারস্যের ম্যানিকিয়ানরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার কেউ কেউ এই চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। অতীতে পারস্য (কাজাখিস্তান,তুর্কমিনিস্তান,ইরাক, আফগানিস্তান) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একেবারে তাইগ্রীস থেকে আক্সাস পর্যন্ত ছিল এর পরিধি । আব্বাসীয়দের ধ্বংস করে ইলখান (মোঙ্গল ১২৫৬-১৩৫৩ খ্রি.) যুগের সূচনা হয়। মূলত, মোঙ্গলদের সময়ই চিত্রসহকারে বইয়ের গুরত্ব বেড়ে যায় । চতুর্দশ শতকের শেষভাগে ১৩৮৬-১৪০১ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল বীর তৈমুর লং পারস্য অধিকার করেন। তাঁর রাজধানী ছিল সমরখন্দ। তিনি চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৩৯৮ সালে তৈমুর লং দিল্লী আক্রমন করেন। তখন দিল্লীতে সুলতানী শাসন প্রচলিত ছিল। পারস্য চিত্রকলায় তিনটি শ্রেষ্ঠ যুগ পরিলক্ষিত হয় যেমন-মোঙ্গল (১২৫৬-১৩৫৩ খ্রি.),তিমুরিদ(১৩৭০-১৫০০ খ্রি.) এবং সাফাভী বা সাফাভীদ (১৫০২-১৭৩৬ খ্রি.)।

তৈমুরের পুত্র শাহরুখ চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর পুত্র রাজকুমার বায়সান্‌কুরও চিত্রের পৃষ্টপোষক ছিলেন । তাঁর সময় চিত্র কারখানা খোলা হয় হেরাতে সেখানে চিত্রকর,লিপিকার,বই বাধাইকারী প্রচুরপরিমানে জড়ো হতে থাকে বলে শোনা যায়। সেই সময়ের পারস্যের বিখ্যাতি চিত্রশিল্পী ছিলেন কামাল উদ্দিন বিহ্যাদ। বিহ্যাদ (১৪৪০-১৫৩৬ খ্রি.আ.)পারস্যে জন্মগ্রহন করে ছেটবেলা থেকেই অভিবাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠেন । ছোটবেলা থেকেই স্বচেস্টায় ছবি আঁকার করণকৌশল রপ্ত করেন ।পরবর্তিতে সুলতান হোসাইন বায়কারার দরবারে নিযুক্ত হন।১৪৬৮ থেকে ১৫০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বায়কারার দরবারের চিত্রশিলাপী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।[১২] তাঁর সম্পর্কে ১৫২৮ সালে তৎকালীন পন্ডিত খাওন্দামীর বলেন :

'' তাঁর চিত্রকর্ম পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পীদের স্মৃতি মুছে দিয়েছে, তাঁর ব্রাশের আঁশ মৃতকে জীবন্ত করেছে এবং তিনি পৃথিবীর রাজন্যবর্গের কাছে যে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তা ভবিষ্যতেও থাকবে ।'' [১৩]

ভারতীয় শিল্প সমালোচক মুলক রাজ আনন্দ তাঁর চিত্রকর্মকে 'highest pictorial art'বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪] বিহ্যাদের নাম ছিল জগৎজোড়া। সেই সময় পারস্যের চিত্রকলায় আসাধরন বুৎপত্তি দেখা যায়। যাকে পারসিক মিনিয়েচার হিসেবে অভিহিত করা হয়। নিজামী রচিত খামশার পান্ডুলিপি চিত্রণে বেশ কিছু অতুলনীয় কাজ দেখা যায় তাঁর মধ্যে **'খাওয়ারনাক দূর্গের নির্মান'** চিত্রটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । ছন্দময় ইটের পর ইট গেঁথে স্থাপত্য নির্মানের চমৎকার ভাব ফুটে উঠেছে এ ছবিতে ।ছবিটি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে (দ্র.চিত্র-১৬) ।

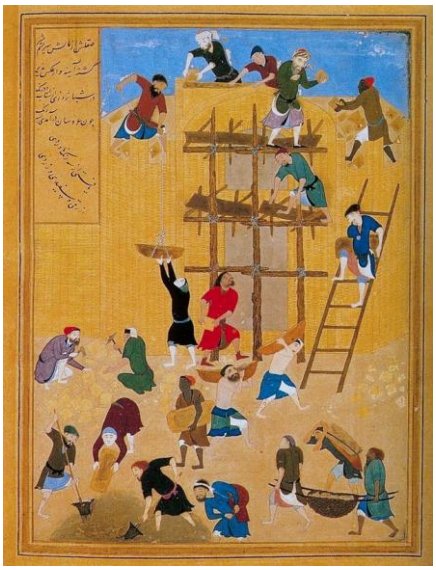

চিত্র-১৬,কামাল উদ-দীন বিহযাদ, খামসা-ই- নিজামী,খওয়ারনাক দূর্গ নির্মান ,১৪৯৪ খ্রি.
লন্ডন ব্রিটিশ মিউজিয়াম ,সূত্র:ইসলামী চিত্রকলা গ্রন্থ

তৈমুরদের পর সাফাভি রাজত্ব শুরু হয়। সাফাভি সুলতান শাহ ইসমাইল (১৫০১-১৫২৪ খ্রি.) রাজত্ব করেন। সাফাভিরা শিয়া মতালম্বীর ছিলেন। তৈমুরদের রাজত্ব অস্থমিত হয়ে আসলে সাফভিরা তৈমুরদের রাজধানী হেরাত দখল করে নেন। এই হেরাত ছিল চিত্রকলা, সাহিত্য, দর্শনের এক আকর জায়গা। শাহ ইসমাইলের পর সাফাভি সুলতান শাহ তাহমাস্পা (১৫২৪ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তিতে চিত্রকলার এক শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হন। শোনা যায় শাহ তাহমাস্পা কামাল উদ্দিন বিহযাদকে ছাত্র সুলতান মোহাম্মদের কাছে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় সাফাভি দরবারের চিত্রকর ছিলেন সুলতান মোহম্মদ,আকা মীরাক, মীর মুসাব্বীর আলী, তাঁর পুত্র মীর সৈয়দ আলী ও মীর্যা আলী প্রমুখ । কামালউদ্দিন বিহযাদ তৈমুরীয় চিত্র থেকে সাফাভি চিত্রের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটান। মুঘলদের হাতে পারস্য চিত্রকলার বুৎপত্তি ঘটলেও মুঘলদের আগেই ভারতে পারস্য চিত্রকলার অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে মুঘল বাদশাহ বাবুরের হাত ধরেই মূঘল চিত্রকলার বুনিয়াদ শুরু হয়। বাবুর হলেন তৈমুরের পঞ্চম বংশধর এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানদের বংশধর। বাবুর তৈমুরীয় রাজত্বের ২০০ বৎসর পর দিল্লী জয় করেন। বাবুর দিল্লীর সিংহাসনে বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেননি তিনি ১৫২৬-১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ এই চার বৎসর স্থায়ী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং পরবর্তিতে চিত্রকলার

এক শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপেষক হন। সেই সময় পাঠান সুলতান শেরশাহ দিল্লী আক্রমন করলে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে ১৫৩৯ সালে সাফাভি সুলতান শাহ তাহমাস্প এর দরবারে আশ্রয় গ্রহন করেন।

পারস্যের সাফাভি সুলতান শহ তাহমাস্প পারস্য চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। তিনি তৈমুরীয় যুগ থেকে সাফাভি যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কামাল উদ-দীন বিহযাদকে রাজকীয় শিল্পীদের মার্যাদা দান করেন। তাব্রিজ তাদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। কামালউদ্দিন বিহজাদের নাম তখন জগৎজোড়া । প্রাচ্যের রাফায়েল বলে খ্যাত। কামাল উদ-দীন বিহযাদের উত্তরসূরী দুই চিত্র শিল্পী মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজি ও খাজা আবুস সামাদের চিত্র হুমায়ুন নাকি তন্ময় হয়ে অবলোকন করতেন। শোনা যায় হুমায়ুন নাকি খাজা আব্দুস সামাদের নিকট শিল্পের নাড়াও বাধেন। শাহ তাহমাস্পের সহযোগীতায় দিল্লীর সিংহাসন উদ্ধার করলে হুমায়ুন মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজী ও খাজা আব্দুস সামাদকে পারস্য থেকে প্রথমে কাবুলে ১৫৪৩ সালে এবং পরে দিল্লীর পুরানা কিল্লায় ১৫৫৫ সালে চিত্র কারখানা খোলে স্থানীয় শিল্পীদের চিত্র শিক্ষা দেন।উক্ত শিলপী দ্বয়ের ভারতে চলে আসার আরেকটি কারণ নাকি জানা যায় সেই সময় শাহ তাহমাস্প চিত্রকলার প্রতি উদাসীন হয়ে ধার্মীক হয়ে উঠেন।[১৫]

মূলত, সাফাভিদের ঐতিহ্যবাহি রাজধানী তাব্রীজ শহরই পারস্য চিত্রকলার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় । সাফাভী রাজত্বকাল (১৫০০-১৭০৭ খ্রি. পর্যন্ত) চলে এবং এর উথ্থান ও পতন দুটি পর্যায় আছে । চিত্রে নানা ধরনের শৈলী দেখা যায় । বিষয় হিসাবে গরু, ভেরা, নানান ধরনের পশুপাখী ছাড়াও প্রতিকৃতি চিত্র দেখা যায় প্রতিকৃতি চিত্র সাফাভী সময় বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে । প্রতিকৃতি চিত্র সাফাভী শিল্পী আকা মিরাকের মাধ্যমে সাফাভী চিত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রতিকৃতি চিত্র পরবর্তি শিল্পী রিযা-ই-অব্বাসীর হাতে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে।তিনি প্রতিকৃতি চিত্রের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে পরিগণিত হন। উদাহরণস্বরূপ **'সাকী'**ছবির কথা বলা যেতে পারে।এ ছবিতে হাশীয়ায় চমৎকার ডিজাইন পরিলক্ষিত হয়।প্রতিকৃতির পশ্চাতে সোনালী রং এর ভিতর লতাগুলম পরিস্ফুটিত হয়েছে।সুরা পরিবেশনরত সাকির মাথার হ্যাটটি ইউরেপীয় যা দেখে মনে হয় ইউরোপীয় প্রভাব তখন থেকেই সাফাভী চিত্রে পড়তে শুরু করে (দ্র.চিত্র-১৭)।

আসলে পারস্য শিল্পী মীর সৈয়দ আলী ও খাজা আব্দুস সামাদ শুধু বিহযাদের ছাত্রই ছিলেন না তাঁদের রিতী তাঁরা ভারতে প্রতিষ্ঠিতও করেন। হুমায়ুনের দরবারে আরো দুজন পারস্য শিল্পীর নাম শোনা যায় একজন মির মুসাব্বির, আরেকজন দোস্ত মোহাম্মদ নামে ।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুঘল চিত্রকলার পূর্নাঙ্গ প্রবেশ হুমায়ুনের হাত ধরেই হয়। পরবর্তীতে মুঘল চিত্রকলা একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রকলার ষ্টাইলে পর্ববসিত হয়। পারস্য চিত্রকলা মুঘল পূর্ববর্তী সুলতানী সময় প্রবেশ করলেও তা পূর্ণাঙ্গ মিশ্রিত রুপ পরিগ্রহ করেনি যা পরবর্তিতে মুঘল দরবারে দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র-১৭, রিজা ই আব্বাসি, 'সাকি', ১৫৯৩-১৬২৯ খ্রি . তেহরান মিউজিয়াম অব ডেকোরেটিভ আর্টস

সূত্র: *ইসলামী চিত্রকলা*

২.৫ বাবুর ও হুমায়ুনের আমলে মুঘল চিত্রকলা

মুঘল রাজবংশের ভিত্তি তৈরী হয় জহিরুউদ্দিন মোহাম্মদ বাবুরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) হাত ধরে। তিনি ১৫২৬ হতে ১৫৩০ এই চার বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান মধ্য এশিয়ার ফারগানা অঞ্চল (বর্তমানে তুর্কমিনিস্তান) তাঁর মধ্যে এশিয়ার দুটি সমৃদ্ধ জাতির মিশ্রণ দেখা যায় মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস (মোঙ্গল) অপরটি পিতা তৈমুরীয় (চাগতাই তুর্কি)। বাবুর ১৫০৪ সালে আফগানিস্তানের কাবুল এবং কান্দাহার দখল করেন। পরবর্তীতে ১৫২৬ সালের মধ্যে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি বেশিদিন সিংহাসনে স্থায়ী হতে পারেননি। শোনা যায় তিনি কবি, দার্শনিক এবং আত্মচরিত রচয়িতা ছিলেন। তাঁর অত্যান্ত মার্জিত সম্পন্ন আত্মচরিত গ্রন্থ 'তুজুখ-ই-বাবুরী' বা 'বাবরনামা'য় ভারতীয় জীবজন্তু ও পশুপাখী সম্পর্কে পর্যবেক্ষনমূলক বর্ণনা দিয়েছেন । তবে উল্লেখ্য যে, 'বাবুরনামায়' পরবর্তীতে চিত্র সংযোজিত হয়েছিল বলে অনেকে ধারনা করেন।জীবজগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি ও মনোভাব পরবর্তিকালে মুঘল বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত ছিল তা বোঝা যায় বিখ্যাত সাফাভী শিল্পী কামাল উদ্দিন বিহযাদ সম্পর্কে এই উক্তিটি অনুধাবন করে তিনি বলেন:

"চিত্রকারদের অন্যতম ছিলেন বিহযাদ, তাঁর শিল্পকর্ম ছিল খুবই উন্নত ধরনের কিন্তু তিনি শ্মশ্রুবিহীন মুখমন্ডল উত্তমরূপে অংকন করতে পারেন নি। তিনি দু ভাজ বিশিষ্ট থুতনিকে খুব লম্বা করতেন। শ্মশ্রুযুক্ত মুখমন্ডল তিনি চমৎকার অংকন করতেন"[১৬]

অর্থাৎ এ থেকে প্রতীয়মান হয় বাবুর চিত্রকলা সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসুক ছিলেন এবং তৎকালীন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিহযাদ সম্পর্কে চিত্রের প্রশংসা সূচক বক্তব্যের সাথে ভূলত্রুটির ও ব্যখ্যা দেন এতে তাঁর চিত্রের প্রতি গভীর অনুরক্ততা প্রকাশ পায়। বাবুর তিমুরিদ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন যার প্রতিফলন দেখা যায় বাবুরি চেহারাবাগ স্থাপত্য সংলগ্ন বাগানে যা পরবর্তীতে মুঘল স্থাপত্যের একটি ল্যান্ডমার্কে পর্যবসিত হয়। তাঁর আত্মজিবনীমূলক গ্রন্থ 'তুখুজ-ই-বাবুরী'তে তিনি উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায় তিনি এদেশের হিন্দু কারিগর, চিত্রশিল্পীদের দক্ষতা সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন আবার অন্যত্র দুর্বলতার জন্য সমালোচনাও করেছেন। তবে শোনা যায় এদেশের আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল। ১৫৩০ সালে তিনি মৃত্যুবরন করেন। বাবুরের পর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে তিনি ১৫৩৯/১৫৪০ সালের দিকে পাঠান সুলতান শেরশাহ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পারস্যের সাফাভী সুলতান শোহ

তাহমাস্পের দরবারে উপনীত হন। পারস্যের সুলতান শাহ তাহমাস্পা চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সেই সময়কার বিখ্যাত সাফাভী চিত্রকরদের সংস্পর্শে আসেন। শোনা যায় তিনি খাজা আব্দুস সামাদ সিরাজীর নিকট চিত্রকলা শেখার জন্য নাড়াও বাধেন। ১৫৫৫ সালের দিকে সাফাভী সুলতান শাহ তাহমাস্পের সহযোগীতায় দিল্লীর সিংহাসন উদ্ধার করলে প্রথমে কাবুলে ১৫৪৩ খ্রি. তারপর দিল্লীর পুরানা কিল্লায় ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারখানা স্থাপন করেন। বিহযদের দুই শিষ্য খাজা আব্দুস সামাদ সিরাজী ও মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজীকে তিনি ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন এবং স্থানীয় শিল্পীদের চিত্রকলা শেখানোর ভার দেন। হুমায়ুন বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ দস্তান- ই- আমীর হামজা তৈরী করতে মীর সৈয়দ আলিকে ভার দেন। সম্ভবত তিনি কাবুলে ১৫৫০ সালে এই গ্রন্থ তৈরী করতে নির্দেশ দেন। বারো খন্ডের এই বইতে প্রতি খন্ডে ১০০টি করে চিত্র ছিল। পান্ডুলিপিটি ছিল তুলোট কাপড়ের উপর সাইজ ২২"x২৮.৫" তৎকালীন সময়ে এরূপ মাপের কাগজ হয়ত অপ্রতুল ছিল। হুমায়ুনের জীবদ্দশায় মাত্র ৬০টি ছবি নিয়ে এই দস্তান-ই-আমীর-হামজা পান্ডুলিপিটির প্রথম খন্ড সমাপ্ত হয়। মোট ১২টি খন্ড হওয়ার কথা ছিল প্রতি খন্ডে থাকবে ১০০টি করে ছবি । পন্ডিতরা বলে থাকেন এই পান্ডুলিপিটাই হল ভারতের বুকে মুঘল চিত্রের ভিত্তিস্বরূপ। যদিও আমরা বাবুরের আত্মজীবনী মুলক গ্রন্থে ভারতের নানা পশুপাক্ষী, লতাগুল্মের ছবি দেখি তা পারস্যের সাফাভী রীতি ধরা পড়লেও এর পরবর্তিতে আমরা ভারতীয় স্বংমিশ্রণ লক্ষ্য করি । উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে পারস্য ছবির মতই পান্ডুলিপিতে আদর্শিক ভাব দেখা যায় পরিপ্রেক্ষিত,শ্যাডো,মন্ডন গুণ,ফিগারে এনাটমিক্যাল সংস্থাপন ছবিতে খুব এক একটা দেখা যায় না ।উদাহরণস্বরূপ ঢাকা জাদুঘরে রক্ষিত এগার শতকের আবুল কাসেম ফেরদৌসী রচিত **'শাহনামা'**(Book of Kings) ছবিটির কথা বলা যেতে পারে (দ্র.চিত্র- ১৮)। এখানে যুদ্ধরত তুরানীয় রাজা আফ্রাসিয়াব এবং রুস্তমের বড় ছেলে বার্জুকে দেখা যায় ।অলংকরণধর্মী ছবিতে দেখা যায় রজা,সৈনিক সব পুতুল সর্বস্ব ফ্ল্যাট কোনো শ্যাডো নেই।উপরে নীচে টেকস্ট ব্যাবহৃত হয়েছে ।ছবিতে সোনার জলের সাথে হলুদ ,কমলা,বেগুনি,সবুজ ইত্যাদি রং ব্যাবহার হয়েছে।তৎকালীন সময় ছবিতে পারস্যের রীতির সাথে পশ্চাৎপটের গাছপালা ফুলফল স্থাপত্যে সুখ্যাতিসুক্ষ কাজ চোখে পড়ে যা একান্তই ভারতীয় এই পান্ডুলিপী তৈরী করতে হুমায়ুন খাজা আব্দুস সামাদের সাথে কিছু ভারতীয় শিল্পীদের নিযুক্ত করেন। শোনা যায় দক্ষিন থেকেও কিছু শিল্পী সেই সময় বিজয়নগর ধ্বংস হলে (১৫৬৩) মুঘল দরাবারে যোগদেন। হুমায়ুন এই পান্ডুলিপীর প্রথম খন্ডটি স্ত্রীকে উপহার দিতে পেরেছিলেন। নানা প্রতিকুলতার মধ্যে পঁচিশটি ছবি ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে

সংগৃহিত আছে। ১৫৫৫ সালে হুমায়ুনের আকস্মাৎ মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আকবর এই পান্ডুলিপি চিত্রের রচনার শেষ করার ভার নেন।

চিত্র-১৮,আবুল কাশেম ফেরদৌসী, শাহনামা (৯৩০-১০২০ খ্রি.) দৈর্ঘ্য ৯ .২.৫ ইঞ্চি x প্রস্থ ৫.২.৫ ইঞ্চি
সংগৃহিত-ঢাকা জাদুঘর,সূত্র:বাংলাদেশ ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনীর পরিচিতি

২.৬ আকবর থেকে জাহাঙ্গীরের সময়কালে ভারতের মুঘল চিত্রকলা

মুঘল চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধিত হয় মূলত, হুমায়ুন পুত্র আকবরের (১৫৫৬-১৬০৬ খ্রি.) সময় হতে মুঘল সম্রাটদের মধ্যে তিনি ভারতের বুকে (অমরকোট) জন্মগ্রহন করেন। শোনা যায় হুমায়ুনের মত আকবরও খাজা আব্দুস সামাদের নিকট চিত্রকলা শিক্ষালাভ করেন। আকবরই মূলত, ইন্দো-পারস্য চিত্রের রূপকার। অর্থাৎ এখানে বলা যায় যে ইন্দো পারস্য রীতির বীজ আকবর বপন করেন কিন্তু তা পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরের সময় পরিপূর্ণ বৃক্ষের রূপ নেয়। আকবরই তাঁর দরবারে চৌহদ্দিতে চিত্র কারখানা স্থাপন করেন। তিনি সপ্তাহে চিত্র কারখানা পরিদর্শন করতেন এবং চিত্রকরদের খোঁজ নিতেন। চিত্র ভাল হলে তিনি শিল্পীদের উপযুক্ত বখশিশও দিতেন। হুমায়ুন পরবর্তি আকবরের সময়ে মুঘল পান্ডুলিপি চিত্র পারস্যের সাফাভী প্রভাব থাকলেও তা আকবরের হস্তক্ষেপে ধীরে ধীরে ভারতীয় রূপ লাভ করে। সম্রাট এই পান্ডুলিপির নাম পরিবতির্ত করে নাম দেন 'হামজানামা' ।এই 'হামজানামা' অংকন করতে মীর সৈয়দ আলিকে ভার দেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত ৭ বছরে এই পান্ডুলিপির মোট চারটি খন্ড হয়েছিল।সম্রাট ১৫৬২ সালে পুনরায় এই পান্ডুলিপির কাজ শুরু করেন এবং ১৫৭৭ সালে এই

হামজানামা ১২টি খন্ডে ১৪০০ ছবি নিয়ে সমাপ্ত হয়। ষোড়ষ শতাব্দীর শেষভাগের ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের চিত্রে পারস্য রীতি এবং ভারতীয় রাজপুত রীতির সহবস্থান দেখা যায়। তেমনি উল্লেখ করা যায়, ওয়ালি অব বাগদাদের আমীর হাসানের প্রতিকৃতি এই ছবিটিতে হিন্দুস্থানের রাজপুত প্রভাব লক্ষ্যনীয়। ইন্দো-পারস্য রীতির সহাবস্থান নিয়ে আকবরের মাতাল পুত্র দানিয়েল একটি চমৎকার উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

" We are tired of wearisome tales of Laila and Majnun, the moth and nightingle Let the poets and artists take for their subjects what we have ourselves seen and heard " [১৭]

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে '' আমরা লায়লা মজনুন, প্রজাপতি এবং বুলবুলের ক্লান্তিজনক কাহিনী শুনিয়া পরিশ্রান্ত। শিল্পী এবং কবিতা এমন বিষয় গ্রহন করুক যাহা আমরা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি। ''এখানে আকবর পুত্র দানিয়েল বোঝাতে চাচ্ছেন যে, অনবরত পারস্যের কাহিনী বিদ্ধৃত করতে করতে একঘেয়েমিতে পর্যবসিত বরং তাঁদের (মুঘলদের) বসবাসরত ভারতীয় পরিবেশ, উপখ্যান, জীবজন্তু ইত্যাদি বিদ্ধৃত করা উচিত।

শিল্পকলা সম্পর্কে আকবরের চিন্তা ভাবনা দানিয়েলের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। আকবরই প্রথম ভারতীয় শিল্পী, ভারতীয়, উপখ্যান, ভারতীয় পরিবেশ চিত্রকলায় স্থান দেন। অর্থাৎ আকবরের শাসন নীতিতে যেমন ভারতীয়দের গুরুত্ব বাড়তে থাকে বিশেষ করে রাজপুতদের গুরুত্ব দেয়া হয় তেমনি ভরতীয় শিল্পী ও ঐতিহ্যবাহী চিত্রেরও গুরুত্ব বাড়তে থাকে ফলে চিত্র eclectic style বা সর্বগ্রাহ রীতিতে পর্যবসিত হয় যদিও অনেক সমালোচক বলে থাকেন জাহাঙ্গীরের সমাঝদারি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভারতীয় মুঘল চিত্রকলা উচ্চ শিখরে আসীন হয়। তথাপি বলা যায় আকবরের সময় হতেই পারস্য রীতির সাথে ভারতীয় রিতীর সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে এমনকি পরবর্তীতে ইউরোপীয় খ্রিস্টীয় চিত্রেরও মিশ্রণ দেখতে পাই। প্রমাণস্বরূপ আকবরের কারখানার দরবারে ১৪৫ জন হিন্দু শিল্পী ও ১১৫ জন মুসলিম শিল্পীর শিল্পী কাজ করত বলে খবর পাওয়া যায়।[১৮] এতে বোঝা যায় আকবর হিন্দু রীতি ও কারিগরদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজা রামমোহনের আগে আকবরই প্রথম সতিদাহ প্রথা রোধ করতে চেয়েছিলেন। আকবর হিন্দুদের শ্রেনীভেদ প্রথারও ঘোর বিরোধী ছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁর চিত্র কারখানায় দাসোয়ান্ত/দশবন্ত নামে এক বালককে রাস্তায় খরিমাটি দিয়ে আঁকতে দেখে এবং তাতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর

দরবারে স্থান দেন। এই দাশবন্ত ছিল জাতিতে কাহার (পালকিবাহকের সন্তান) সম্প্রদায়ের।ঐতিহাসিক আবুল ফজলের সাক্ষ্য মতে দশবন্ত মুঘল দরবারে আসেন ১৫৬৫-১৫৭০ সালের দিকে। দশবন্ত আকবরের কারখানায় আব্দুস সামাদের তত্ত্বধানে চিত্রকলায় অত্যান্ত বুৎপত্তি লাভ করে। তাঁর উপর হিন্দু জনপ্রিয় মহাকাব্য 'রজমনামা' (মহাভরত) চিত্রায়নের ভার দেয়া হয়। এই পান্ডুলিপি চিত্রের সাথে অন্যান্য শিল্পী যেমন বাসোয়ান, লাল এবং মুসলিম শিল্পীদেরও সম্পৃক্ততার খবর পাওয়া যায় অল্প দিনের মধ্যেই দশবন্ত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন এবং সম্রাট আকবরও তাঁর গুনগ্রাহী ছিলেন। তাঁর স্বাক্ষরিত কিছু ছবি পাওয়া যায় সম্ভবত ১৫৮০-১৫৮৪ সালের দিকে যেমন- তুতিনামা, তারিখ-ই-তিমুরিয়া ইত্যাদি ছবিতে। এসব পান্ডুলিপি চিত্রে অনেক শিল্পীর ভিড়ে তাঁর স্বকীয়তা পাওয়া যায়। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদিতে তাঁর আলাদা ছাপ স্পষ্ট এমন কি পরিপ্রেক্ষিতেরও আভাস পাওয়া যায় যা মুঘল চিত্রকলায় পূর্বে অনুপস্থিত। আবুল ফজলের মতে, আকবরের সুনজরে যে কয়জন শিল্পী ছিলেন তাঁর মধ্যে বাসোয়ানের নামও পাওয়া যায়। পান্ডুলিপি চিত্রের প্রেক্ষাপট রঙের ব্যাবহার ও প্রতিকৃতি রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত ।

আকবরের কারখানায় যে দরবারি চিত্র উৎপাদিত হত তা একক কোন শিল্পীর ছিল না। একটি ছবি সম্পাদন করতেন জনা কয়েক শিল্পী মিলে অর্থাৎ একজন রেখাচিত্র অংকন করতেন তো অন্যজন রং দিতেন এবং অপরজন অলংকরণ করতেন। শিল্পীরা তাঁদের শ্রম অনুসারে মাসিক মাহিনা (তঙ্কা) পেতেন। আকবর এখানে division of labour পদ্ধতি সৃষ্টি করেন অতীতে পারস্যে এই ধরনের পদ্ধতি ছিল। একারণে পন্ডিত পার্সি ব্রাউন মুঘল চিত্র সম্পর্কে বলেন :

''Such a system of production seems to suggest that the painting of Mughal pictures was more of a craft than a fine art.'' [১৯] এখানে পার্সি ব্রাউন মুঘল চিত্রকলাকে ফাইন আর্ট অর্থাৎ চারুশিল্প অপেক্ষা অতিমাত্রায় শ্রম শিল্পের কারণে হয়ত কারুশিল্পের সাথে তুলনা করেছেন কিন্তু মুঘল চিত্রকলা বিভিন্ন পর্যায় অনুধাবন করলে এর কোন কোন পর্যায় ভাব লাবন্যের কারনে রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। তাই মুঘল চিত্রকলাকে ঢালাওভাবে কারুশিল্প বলা যায় ন।

সম্রাট আকবরের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল প্রখর পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে তিনি সতিদাহ প্রথা রদ করতে চেয়েছিলেন তেমনি প্রাণী হত্যারও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তেমনি একটি ছবির উদাহরণ হল

আকবরনামায় প্রণীহত্যার অবসান। ছবিতে দেখা যায় আকবর মনোরম পরিবেশে গাছের নীচে মর্মাহত অবস্থায় বসা।তাঁর সামনে হত্যাকৃত প্রাণী। তিনি হয়ত প্রাণীদের অস্তিত্ব সম্পর্কেব বুঝতে পেরেছিলেন যে নির্বিচারে হত্যা বন্ধ করা উচিৎ (দ্র.চিত্র-১৯)।পাশাপাশি আকবরের সময়েই মুঘল দরবারে খ্রিস্টান মিশনারীদের উপস্থিতি বেড়ে যায় এবং সাথে ইউরোপীয় চিত্রেরও আগমন ঘটে। তবে ভরতে ইউরোপীয়দের আগমনের সূচনা ঘটে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার ভারতবর্ষের কালিকট বন্দরে আগমনের মাধ্যমে। এর ফলে ইউরোপীয় বিশেষ করে পর্তুগীজরা ভারতের কোচিন, গোয়া ও কালিকটে কারখানা স্থাপন করেন। ষোড়শ শতকেই পর্তুগীজদের ঐসব জায়গায় ব্যাবসা-বানিজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকে। সম্ভবত ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর গুজরাট অভিযানের সময় তিনি পর্তুগীজদের উপস্থিতি টের পান। শোনা যায় তিনি ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল দরবারে একজন পর্তুগীজ কর্মচারীকে দরবারে নিয়োগ দেন। অনুরূপ হাজী হাবিবুল্লা নামে একজন রাজ কর্মচারীকে গোয়ায় প্রেরন করেন। আকবর ফতেপুর সিক্রিতে রাজধানী স্থাপনে করেন এবং সেখানে ১৫৭৩-১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিভিন্ন ধর্মবলম্বীকে ফতেপুর সিক্রিতে ধর্মীয় আলোচনায় আমন্ত্রিত করে নিজে অংশগ্রহন করতেন। খ্রিস্টান চিত্রকলার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের কথা শোনা যায় মরিয়ম গৃহে অ্যানানসিয়শানের ভিত্তিচিত্র স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে অংকন করেন। খাবগায়েও খ্রিস্টান চিত্ররীতির অনুকরণে সমুদ্রভিযানের পালতোলা নৌকার চিত্র অংকিত হয়। শোনা যায় মুঘল দরবারের চিত্রকরেরা সমুদ্রাভিযানের কোনো দৃশ্য অবলোকন করেননি তাহলে প্রশ্ন আসে কিভাবে সে দৃশ্য অংকিত হল? মুঘল শিল্পীরা বাইবেলের সহায়তা নিয়ে খাবগায়ের সমুদ্রাভিযানের দৃশ্য অংকন করেন এবং যথাযত ফুটিয়ে তোলেন।

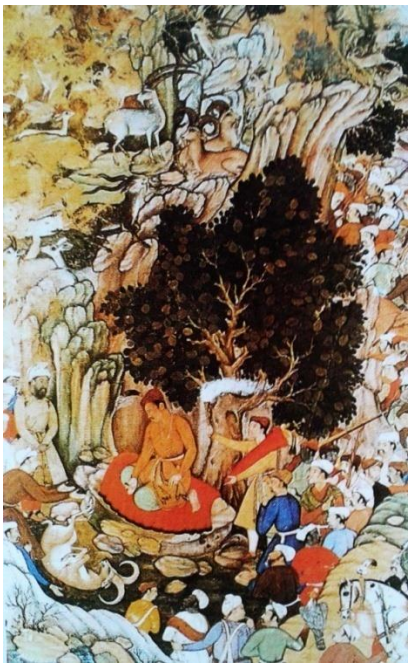

চিত্র১৯- সম্রাট আকবর প্রাণীহত্যা অবসানের নির্দেশ দিচ্ছেন, আকবরনামা , আ.১৫৯০খ্রি.

সূত্র:ভারতের চিত্রকলা (১ম খন্ড)

ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আকবরনামায় (১৬০২-১৬০৬ খ্রি.) দেখা যায় জেসুইট পাদ্রি ফাদার রুডলফ একুয়াভিভা এবং অপর একজন যীশুপন্থী আকবরের সাথে আলাপচারিতায় রত। এতে সহজেই অনুমেয় যে মুঘল চিত্রকলায় আকবরের সময় হতেই ইউরোপীয় বিষয় বস্তুর আগমন ঘটতে থাকে। এমনও শোনা যায় আকবরের দরবারের অন্যতম শিল্পী কেশব দাসকে তিনি শুধু খ্রিস্টান বিষয়বস্তুর উপর ছবি আঁকতে নির্দেশ দেন। আনুমানিক ১৫৮৮ সালের দিকে কেশব দাস বাধাইকৃত যে মুরাক্কা বা এ্যালবাম উপহার দেন তা পুরোপুরি বছাইকৃত ইউরোপীয় অনুকরণে আঁকা ছিল।

সেই সময় ইউরোপীয় প্ররিপ্রেক্ষিত রচনা মুঘল ছবির মধ্যে স্পষ্ট হতে থাকে। এর আগে আমরা মুঘল ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত তা সাধারণ চোখে দেখার মত দেখা যায় না। মুঘল চিত্রে অনেকটা অজন্তা ভিত্তি চিত্রের মত মাল্টি পার্সপেক্টিভ দেখি। এখানে উদাহরণ টানা যেতে পারে **‘একজন ইউরোপীয়র প্রতিকৃতি’** চিত্রের কথা যা আনু. ১৫৯০ সালের দিকে অংকিত এবং ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।এ ছবিতে দন্ডায়মান ইউরোপীয় সৈনিকের পেছনে গাছপালা ঘরবাড়ি, পাহাড় যা দিগন্তে বিলীন ।দুরে ইউরোপীয় মহিলাদের দেখা যাচ্ছে হিন্দু রীতিতে মন্দিরের মাথা নত অবস্থায় (দ্র.চিত্র-২০) মন্দির, গীর্জা, কুড়েঘর

স্বাভাবিক মানের এ ছবিতে মুঘল চিত্রের ডিজাইনের ভাব অনুপস্তিত ।অনুরূপ খ্রিস্টান চিত্রের মতই হিন্দু রাজপুত রীতির সমন্বয় দেখা যায় তৎকালীন মুঘল চিত্রকলায় । তেমনি পান্ডুলিপি হচ্ছে 'রজমনামা' মহাভারতেন ফার্সি অনুবাদ যা মোল্লা আব্দুল কাদের বদাউনির এবং নাকিব খানের তত্বাবধানে শুরু হয় এবং আনুমানিক ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৭ মাসে এ পান্ডুলিপিটির চিত্রায়ন সম্পন্ন হয়। এরপর তিনি রামায়নের পান্ডুলিপির কাজ করেন এবং ৪ মাসের মাথায় অনুবাদের কাজ শেষ করেন।এ চিত্র চলাকালেই দশবন্ত উন্মাদ অবস্থায় আত্মহত্যা করেন।[২০] মীর সৈয়দ আলি ১৫৬৭ সাল নাগাদ মক্কায় হজ্ব করতে চলে গেলে খাজা আব্দুস সামাদের সাথে অন্যান্য যে সব ভারতীয় চিত্রকর পাওয়া যায় তারা হলেন বাসওয়ানা, ভগবান, কেশু (কেশব), লাল, মিসকিন, মুকুন্দ, মাধব, জগন, খেমকরন, তারা,সাওঁলা প্রমুখ।বাসাওয়ান ও হুসাইন নাক্কাশের হরিবংশ অংকিত একটি রামায়ন পান্ডুলিপি চিত্রের কথা উল্লেখ করতে হয় এখানে দেখা যায় চরিত্রের পোষাক, স্থাপত্য দরজা জানালা কার্পেটের ডিজাইন পারসিকা আবার মানুষ ফিগার, গাছগাছালি ভারতীয় । আরেকটি ছবির কথা বলা যেতে পারে 'রজম-নামা' পান্ডুলিপিতে শিল্পি ভগবান অংকিত **'নারী পরিবেষ্টিতি কৃষ্ণের হারেমে উৎসর্গকিত ঘোড়া'** ছবিটির কথা।

চিত্র–২০ , একজন ইউরোপিয়ান(এ্যালবাম চিত্র) মাপ- ৩০সি.এম.x১৮.৩ সি.এম.সংগৃহিত: ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম,সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

এ ছবিতে দেখা যায় পান্ডব রাজা যুধিষ্ঠির উৎসর্গকিত ঘোড়াটি কৃষ্ণের প্যালেসে নিয়ে এসছেন।উৎসুক হারেমের নারীরা ঘেড়াটিকে দেখতে ব্যাস্ত।বৃত্তাকার তাবুর ভিতরে যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণ আলাপচারিতায় মগ্ন ।ছবির কম্পোজিশানে অভিনবত্ব পাওয়া যায় এবং ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে সৈনিক,পাহাড়,গাছপালা পারসিক শৈলির। আবার হারেমের নারীদের পোষাক-আশাক ভারতীয় (দ্র.চিত্র-২১)।এ থেকে প্রতীয়মান হয় মুঘল চিত্র একটি মিশ্র রীতির প্রতিফলন। মুঘল চিত্র মিশ্রিত রূপ হলেও একটি স্বকীয়তার ভাব তখন থেকেই স্পস্ট হয়ে উঠে এবং এসব ছবিতে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যতা স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতের কারণে বাস্তবসম্মত এবং জীবন ঘেষা মনে হয় যা মুঘল চিত্রকলার পূর্বসুরী পারস্য চিত্রকলায় অনুপস্থিত পারস্য চিত্রকলা একধরনের কল্পনার আশ্রয়ে গড়ে উঠে যা টাইপড এবং স্থবির।

আকবরের চিত্রকলার প্রতি এতটাই মোহ ছিল যে তাঁর রাজ দরবারে যেসব ওমরাহরা ছবি পছন্দ করত না তাদের প্রতি তাঁর সুনজর ছিল না। হুমায়ুনের দরবারের শিল্পীদের আকবরের সময়ই প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি পিতার (হুমায়ুনের) মত আব্দুস সামাদের নিকট চিত্র শিক্ষা গ্রহন করেন তিনি চিত্রকর না হলেও ভারতের শাসনভার গ্রহন করেও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং ভারতীয় চিত্রকলাকে ভিত্তিপ্রস্তর দান করেন। আকবরই প্রথম ভারতীয় শিল্পী, ভারতীয় উপখ্যান, ভারতীয় পরিবেশ চিত্রকলায় স্থান দেন। চিত্রকলা সম্পর্কে আকবরের এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে চিত্রের প্রতি তাঁর মমত্ব বোধ অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন:

"আমার মনে হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালাকে উপলব্ধি করার জন্য চিত্রকরের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কারণ চিত্রশিল্পী জীবন্ত কোনো বস্তুর চিত্রাংকন এবং এর অঙ্গ-প্রতঙ্গ একটির পর একটি সংযোজনে বুঝতে পারে যে, সে তার সৃষ্টিকালে ব্যাক্তিত্ব অর্থাৎ জীবন দান করতে পারবে না এবং এ কারণে জীবনদাতা আল্লাহ্ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং এরূপে তার দিব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।"[২১]

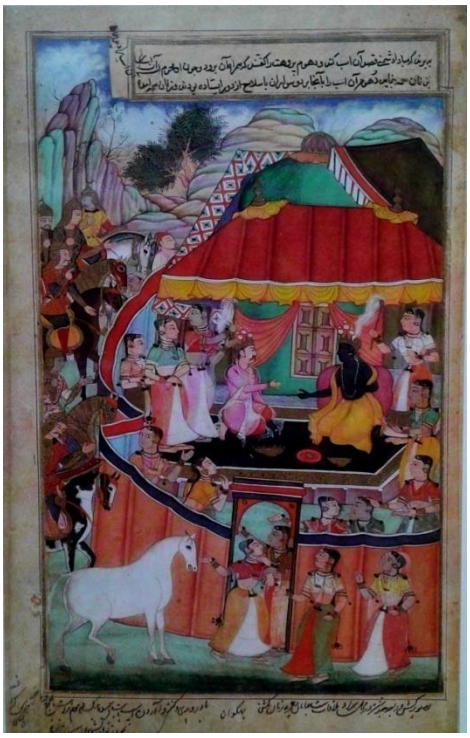

চিত্র -২১ , নারী পরিবেস্টিত কৃষ্ণের হারেমে উৎসর্গকৃত ঘোড়া ,রজমনামা পান্ডুলিপি চিত্র, ১৫৯৮খ্রি.
শিল্পী-ভগবান, মাপ-২২.৯সি.এম x১৪ সি.এম. সংগৃহিত : ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন,সূত্র: ললিতকলা একাডেমী পোর্টফোলিও

মুঘল চিত্রের স্বতন্ত্রতা ও নানান বাঁক, উৎকর্ষতা মূলতঃ জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) সময়ই হয়। তাঁর সময়ই ভারতীয় রাজপুত চিত্রকলা ও পারস্য চিত্রকলার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়ে মুঘল চিত্রকলা বা "Mughal Painting" নামে অভিহিত হয়ে অনন্য চিত্রকলা হিসাবে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেয়। জাহাঙ্গীরের রক্তের মধ্যেও দুটি ধারা বহমান ছিল। যেমন- রাজপুত (যোধাবাই যিনি মানসিংহের ভগিনী আকবরের স্ত্রী) এবং পারস্য (চুগতাই তুর্কি ও মোঙ্গল ধারা) । এই দুটি ধারা যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় এক দেহে হল লীন অর্থাৎ পূর্বের সমস্ত ধারা একটি জায়গায় এসে একাত্বতা লাভ করে। জাহাঙ্গীর শুধু উচ্চমানের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না ছিলেন উচ্চমানের চিত্র সমালোচকও। মুঘল চিত্র সম্পর্কে পার্সি ব্রাউনের উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তিনি বলেন : "আকবর যে ডিম পাড়েন (মুঘল চিত্রকলা সম্পর্কে) তাতে জাহাঙ্গীর তা দেন।"[২২] অর্থাৎ আকবর মুঘল চিত্রকলার ভিত্তি প্রস্তর তৈরী করলেও জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৭২৭খ্রীঃ) সেই ভিত্তির উপর ইমারত তৈরী করেন। পন্ডিতরা বলে থাকেন তাঁর মুঘল চিত্রকলার বুনিয়াদ তৈরী করতে সাহায্য করেছিলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। এছাড়াও জাহাঙ্গীরের শিল্পের প্রতি ছিল

গভীর অনুরাগ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা । আকবর যুদ্ধবিগ্রহে এত ব্যস্ত ছিলেন এবং বিশাল মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তাকে সর্বদাই ব্যাস্ত থাকতে হয়েছে। জাহাঙ্গীরের সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আকবরের ন্যায় তেমন মনোযোগ দিতে হয়নি। তবে এখানে যোগ করা যেতে পারে যে, সম্রাজ্য বিস্তার হয়ত আকবরের মত সময় ক্ষেপন না করলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র দমনে জাহাঙ্গীরকে সদাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। জাহাঙ্গীর তাঁর প্রপিতামহ (বাবুর) এর মত দিনপঞ্জী লেখা, শিকার, পশুপাখী, উদ্ভিদ ইত্যাদি ভালবাসতেন এবং তিনিই মুঘল চিত্রকলা পান্ডুলিপি থেকে মুক্তি দেন।

আবুল ফজলের ভাষ্যমতে আকবরের সময় শতাধিক চিত্রশিল্পীর খবর পাওয়া গেলেও জাহাঙ্গীরের সময় শিল্পীর সংখ্যা দাড়ায় ৪৩ জন হিন্দু এবং ৪১ জন মুসলিম। অর্থাৎ এতে বোঝা যায় জাহাঙ্গীরের সময়ই মুঘল চিত্র শিল্পীর সংখ্যা সংকুচিত হয়ে আসে তথাপি মুঘল চিত্রকলা বিশেষ আঙ্গিকের জন্য উৎকর্ষতায় পর্যবসিত হয়। মুঘল চিত্র দরবারি মহিমা থেকে বেরিয়ে পশুপাখি, উদ্ভিদ এমনকি অপাংক্তেয় মানুষজনও মুঘল চিত্রে ঠাই পেতে থাকে। যুবা বয়সেই জাহঙ্গীরের চিত্র প্রীতির কথার খবর পাওয়া যায়। আকবরের বিরুদ্ধে যুবা বয়সে জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ ঘোষনা করলে এলাহবাদে ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেন এবং এখানেই তিনি চিত্রকারখানা খোলেন। সেই সময় বেশ কয়েকটি পান্ডুলিপি চিত্রের ফরমায়েশও দেন বলে শোনা যায়। আমীর হাসান দেহলভির দেওয়ান, রাজকুনওয়ার (উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় কাহিনী), আনোয়ার-ই-সুহাইলি ইত্যাদি পান্ডুলিপির সাথে তিনি কিছু 'মুরাক্কা' বা এ্যলবামেরও ফরমায়েশ দেন বলে জানা যায়।[২৩]

জাহঙ্গীরের সময়েই মুঘল শিল্পীদের স্বতন্ত্রতা বা স্টাইল গড়ে ওঠে কেউ প্রতিকৃতি কেউ বা প্রকৃতি আবর কেউ জীবজন্তু উদ্ভিদ আঁকতে কৃতিত্ব দেখান। প্রতিকৃতির ভার দেয়া হয় বিষনদাসকে, প্রকৃতির ভার পড়ে আবুল হাসান এবং জীবজন্তু উদ্ভিদের ভার পড়ে ওস্তাদ মনসুর ও মনোহরের উপর। ছবি আঁকার দক্ষতা অনুসারে পদমর্যাদও বৃদ্ধি করতেন। আবুল হাসানকে তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরীর নামপত্র (ফ্রন্টোসপিস) অংকন করার জন্য তিনি নাদির-উজ-জামান (জগতের শ্রেষ্ঠ) উপাধি দেন। আবার ওস্তাদ মনসুরকে ভারতীয় ফুল পশুপাখি আঁকায় দক্ষতা দেখানো জন্য তিনি মনসুরকে নাদির-উল-আসর (জগতের অতুলনীয়) বলে আখ্যা দেন এবং বলেন তাঁর শিল্প তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ। হিন্দু শিল্পীদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশ্লেষণধর্মী তিনি বিষনদাস সম্পর্কে মন্তব্য করেন প্রতিকৃতি অংকনে তাঁর সমকক্ষ কোন শিল্পী নেই। জাহাঙ্গীরের সময় মুঘল চিত্রের একটি বিশেষ তাৎপর্য হল চিত্রে নারীদের এবং নারী শিল্পীদের উপস্থিতি পূর্বে আকবরের সময়

'হারেম' বা 'জেনানামহলে'র নারীদের চিত্রায়নে অনর ভাবভঙ্গি ছিল সব যেন পুতুল সর্বস্ব। একমাত্র জাহাঙ্গীরের সময়ই নারীদের নিজস্ব সত্বায় উপস্থিত হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে এ.কে. দাস যথার্থই বলেন: `` The Ladies of the royal household are portrayed for the first time in art ''[২৪] এ থেকে সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া যায় যে,শুধু শিল্পে নয় শিল্পের কর্মকান্ডেও নারীদের উপস্থিতি বাড়ে যেমন মুরাক্কা-ই-গুলশান যা গুলশান প্যালেস লাইব্রেরী তেহরানে সংগৃহিত আছে। এ এ্যলবামে নাদিরাবানু এবং আকা রিজা হেরাতি দুজন শিল্পীর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় সম্রাট নারী শিল্পীদের চিত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন সম্ভবত আকা রিজা হিরাতি নারীদের শিল্প শিক্ষক ছিলেন। 'হারেম' যা ছিল নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান।বাইরের সাথে যোগাযোগ ছিল না তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানের পূর্বের প্রথা ভেঙ্গে নারীদের শিল্পে অংশগ্রহন ঘটান সম্রাট জাহাঙ্গীর।

ফলশ্রুতীতে আমরা পাই নাদিরা বানু ছাড়াও সুফিয়া বানু, রুকিয়াবানু, নিনি প্রমুখ শিল্পীদের। জাহাঙ্গীরের মত নুরজাহানও শিল্পের সমাঝদার ছিলেন। নুরজাহানকেও শিল্পের কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতেন শোনা যায়। জাহাঙ্গীরের সময়ই মুঘল হারেমের নারী শিল্পীদের উৎকর্ষতা সন্দেহাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায় লেখক, কবি, দক্ষ অক্ষরচিত্রি ও চিত্রকরদের মধ্যে।

জাহাঙ্গীরের চিত্রশালায় প্রধানত তিন ধরনের চিত্র অংকিত হত। প্রথমত - পান্ডুলিপি চিত্রাবলী অর্থাৎ মিনিয়েচার, দ্বিতীয়ত-পোট্রেট অর্থাৎ প্রতিকৃতি, তৃতীয়ত-ফুল লতা পাতা প্রভৃতি। বিপরীতে আকবরের চিত্র কারখানায় মিনিয়েচার আর সামান্য প্রতিকৃতির অংকনের চর্চা দেখা যায়। ১৬০৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেই জাহাঙ্গীর উত্তরাধিকার সুত্রে আকবরের চিত্র কারখানা ও লাইব্রেরি লাভ করেন এবং সম্রাট তাঁর কলেবর বৃদ্ধি করেন।পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে মুঘল দরবারে জেসুইট পাদ্রিদের দলে দলে দরবারে আগমন ঘটতে থাকে। আকবরনামায় (১৬০২-১৬০৬ খ্রি.) ফাদার রুডলফ একুয়াভিভা ও আকবরের সাক্ষাতের দৃশ্য অংকিত হয়েছে। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীর তাদের সহচর্যে আসেন এবং তিনিও ইউরোপীয় ছবির ভক্ত হয়ে উঠেন। শোনা যায় সম্রাট যুবা বয়সে যখন তার নাম সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীর হয়ে উঠেননি তখন মাতা মেরী সম্বলিত লকেট গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং ইউরোপীয় পাদ্রিরা তাঁকে উপঢৌকন উপহার দিতে চাইলে তিনি ইউরোপীয় ছবির খোঁজ করতেন। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো ১৬১৫ হতে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল দরবারে অবস্থান করেন। টমাস রো'র চিঠিপত্র হতে জাহাঙ্গীরের ছবির প্রতি অনুরক্ততার কিছু ছবি ফুটে ওঠে। টমাস রো তাঁর ছবির প্রতি আগ্রহের কথা শুনে

বিখ্যাত ইংরেজ মিনিয়েচার শিল্পী আইজাক অলিভারের আঁকা একটি মিনিয়েচার ছবি উপহার দেন। জাহাঙ্গীর টমাস রোর সাথে বাজি ধরেন এবং বলেন তাঁর শিল্পীরা এমন নকল করে দেবেন যে সে আসল নকল বুঝতে পারবে না পরবর্তীতে রো বলেন যে, সত্যিই সে তার সামনে পেশ করা পাঁচটি নকল ছবি সে প্রথমত শনাক্ত করতে পারেননি। অর্থাৎ জাহাঙ্গীর এখানে বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর শিল্পীরা ইউরোপীয় যে কোন শিল্পীদের সমকক্ষ। টমাস রো প্রথম দিকে ভারতীয় ছবির ভক্ত না হলেও জাহাঙ্গীরের সাথে ভারতীয় ছবি সম্পর্কে আলোচনার পর ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। তিনি তৈলচিত্র উপহার দিতে চাইলে পুর্বাপর সম্রাটদের মত জাহাঙ্গীর তা ফিরিয়ে দেন।এখানে উল্লেখ্য যে জাহাঙ্গীর তৈলচিত্র পছন্দ করতেন না তা টমাস রোর উক্তি থেকেও জানা যায়। ফলশ্রুতিতে মুঘল চিত্র বা ভারতীয় চিত্রকলা সম্রাটদের পছন্দমত ভাব প্রধান হয়ে ওঠে।

মুঘল দরবারে সবচেয়ে গৃহিত ছিল অণুচিত্র ও ছাপাই ছবি যা ইউরোপীয় শিল্পরসিক মহলে মহৎ ছবি হিসাবে গৃহিত হয়নি। এ ধরনের কিছু নান্দনিক পার্থক্য তখন থেকেই ভারতীয় চিত্রকলায় লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু মুঘল চিত্রকলা দরবারি চিত্রকলা এবং সম্রাট, আমীর, ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় তার বেড়ে উঠা এবং এর রস আস্বাদনও করতেন দরবারি লোকজন। আম জনতার সাথে প্রথম দিকে এর কোন সম্পর্কই ছিল না। সেহেতু সম্রাট বাদশাহরা যা পছন্দ করত সেই মোতাবেক চলত এবং পরবর্তীতে ফলাফলও সেই মোতাবেক ঘটতে থাকে। ভারতীয় ছবি বাঁক নেয় অণুচিত্রে, অলংকরণে, কল্পনামিশ্রিত হয়ে আধ্যাত্মিক মোড়কে। তথাপি সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গীরের দুরদর্শিতার কারণে মুঘল চিত্রকলা শুধু ভারতবর্ষে নয় ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীরের সময় প্রতিকৃতি চিত্রণ বিশেষ তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত প্রতিকৃতি রচনা করা হত রাজদরবারকে স্মরনীয় করে রাখার জন্য অর্থাৎ আমরা যেমন বর্তমানে দেখি ফটোগ্রাফি দিয়ে ইতিহাসের দলিল তৈরী করা। ঠিক মধ্য যুগেও মুরাক্কা (এ্যলবাম) বা পান্ডুলিপি তৈরী করে ইতিহাসের দলিল তৈরী করা হত। সাধরণত মুঘল প্রতিকৃতি শিল্পীরা চিত্রণ করত এক ঝলক দেখে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে। শোনা যায় হারেমের মহিলাদের আয়নার প্রতিফলন ঘটিয়ে শিল্পীদের দেখানো হত। এইরূপ এক ঝলক দেখে প্রতিকৃতি আঁকার রীতি মোঙ্গল যুগেও দেখা যায় তা ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনীতেও বর্নিত হয়েছে।একমাত্র আকবরের সময়ই দেখা যায় মডেলকে আশ্রয় করে প্রতিকৃতি অংকন করতে । আকবর নাকি নিজেও মাঝে মাঝে মডেল হত এটি ইউরোপীয় প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত। জাহাঙ্গীরের সময়ও এর ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তাঁর আত্ম জীবনী ‘তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরী’তে উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে

তিনি পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাসের নিকট খান আলমকে দূত হিসাবে পাঠান এবং সাথে প্রতিকৃতি শিল্পী বিষনদাসকেও পাঠান। তিনি শিল্পীকে হুকুম করেন পারস্যের রাজ সভাসদদের প্রতিকৃতি ঠিকমত আঁকার জন্য। এসব প্রতিকৃতি যখন দরবারে পেশ করা হত তখন পোষাক আশাক তরবারিতে কোন সমস্যা হলে তা মডেল দেখে ঠিক করে নেওয়া হত। মুঘল দরবারে প্রতিকৃতির চলন ছিল সবসময় তা শাহজাহানের একটি উক্তি থেকে বোঝা যায়। একটি প্রতিকৃতি চিত্রে তাঁর স্বাক্ষর কৃত হাতের লেখা পাওয়া যায়। লেখাটি হচ্ছে – "আমার চল্লিশ বছরের ছবি এঁকেছে বিচিত্র"।[২৫] এ থেকে লক্ষ্যনীয় যে একই ব্যাক্তির প্রতিকৃতি চিত্র যদি কয়েক বছর পর পর মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে শুধু যে তাদের চিনতে পারা যায় তা নয় এদের শারীরিক পরিবর্তনও চোখে পড়ে। অনেকেই বলে থাকেন মুঘল প্রতিকৃতি অধিকাংশই প্রোফাইল বা অর্ধস্য (একপাশ থেকে দেখা) এই প্রফাইল ধারনাটি রাজপুত শৈলী থেকে আসা। মুঘল প্রতিকৃতি সাধরণত ত্রি-কোয়ার্টার। পরবর্তীতে মুঘল চিত্রে এই দুই ধরনের প্রতিকৃতিই দেখা যায়। আবার কিছু প্রতিকৃতি দেখা যায় দেহটি সম্মুখে মুখটি প্রফাইল (অর্ধস্য)। এই ধারনাটি আবার প্রাচীন মিশরীয় ও আসিরীয় থেকে আসা। প্রতিকৃত্রি চিত্ররচনায় কিছু নিয়ম লক্ষ্যনীয়। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রকৃতিকে নিছক অনুকরণ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মডেলের একটি আপেক্ষিক সম্পর্ককে পরিস্ফুট করা। মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রে যেমন ঋতুর পরিবর্তনের আমেজ ফুটে উঠেছে তেমনি ব্যাক্তির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছে।

তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি হচ্ছে '**মৃত্যুপথযাত্রী এনায়েৎ খাঁ**'র ছবি। এনায়েৎ জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন। অত্যাধিক মদ্যপান ও আফিং খাওয়ার জন্য তিনি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। জাহাঙ্গীর তার প্রতিকৃতি অংকন করার জন্য শিল্পীদের গৃহে পাঠান যেহেতু অসুস্থ থাকার কারনে এনায়েৎ খাঁকে দরবারে আনা সম্ভব ছিল না। এনায়েৎ খাঁর দুটি ছবি পাওয়া যায় একটি সাদাকালোর করা স্কেচধর্মী আরেকটি রঙিন বিছানায় শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী। তাঁর বুকের সারি সারি পাঁজর দেখা যাচ্ছে যা শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা। এনায়েৎ খাঁর চক্ষু কোটরাগত, জীর্নশীর্ন মুখে ভাবলেশহীন যেন নিয়তির করুন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত (দ্র.চিত্র- ২২)।

চিত্র-২২ , মৃত্যুপথযাত্রী এনায়েত খাঁ, ১৬১৮ খ্রি. ১২.৫x ১৫.৩ সে.মি.সংগৃহিত: বডলিন লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড,

সূত্র:ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং গ্রন্থ

এ ছবি থেকে বোঝা যায় মুঘল প্রতিকৃতি চিত্র শুধু নিছক মানুষের অবয়বই নয় রচনা করা হয় পরিবেশ আবহ ও তাৎক্ষনিক ইতিহাস। আরেকটি ছবি **'জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন'** প্রমাণ করে মুঘল চিত্রকলার স্বর্ণযুগে শিল্পীদের অপরিসীম দক্ষতা। আবুল হাসান অংকিত ভুগোলোকের উপর আলিঙ্গনরত সম্রাট জাহাঙ্গীর ও পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাসের প্রতিকৃতিটির কথা।ছবিটি আনুমানিক ১৬২০ সালে আঁকা ।এ ধরনের ছবিকে খেয়ালি তসবির বলা হয়ে থাকে ।ব্যাঙ্গাত্বক এবং প্রতিকী এ ছবিতে দেখা যায় জাহঙ্গীরের পায়ের তলায় শান্ত সিংহ যা মুঘল রাজ শক্তির প্রতিক অপরদিকে শাহ আব্বাসের পায়ের তলায় সাদা ভেড়া যা বীর্যহীনতার পরিচয় দেয়।দেহের পেছনে দেখা যায় অর্ধ বৃত্তাকার চন্দ্র, সূর্য যা পবিত্র দেব শিশুগন ধরে আছে।এই পবিত্র প্রভামন্ডল জাহাঙ্গীরের নামের অংশ নুরউদ্দিন অর্থাৎ জগতের আলোকে অর্থবহ করে তোলে (দ্র.চিত্র-২৩) ।তবে এ ছবিতে শিল্পী বিষনদাসের সহযোগিতা আছেন বলে অনেকে মনে করেন।

চিত্র-২৩ ,জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন (এ্যালবাম চিত্র),১৬১৮-২২খ্রি:২৪x১৫ সি.এম.
সংগৃহিত:ফ্রিয়ার গ্যালারি অফ আর্ট, ওয়াশিংটন,সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

জাহাঙ্গীর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায় **''রাজকুমার খুররমের তুলাদান অনুষ্ঠান'** চিত্রটি অনুধাবন করলে।এটি হিন্দু রীতি থেকে নীত।বৎসরের দুইবার সৌর মাসে এবং চন্দ্র মাসে এই এই তুলাদান অনুষ্ঠান হত যা আকবরের আমল থেকেই প্রচলিত ছিল।ছবিতে দেখা যায় জাহাঙ্গীর খুররমকে (শাহজাহান) একটি পাল্লায় বসিয়ে অপর পাল্লায় সোনা,রূপা,হিরা,জহরৎ দিয়ে ওজন করছেন।ছবিতে দরবারের আমার্ত্যদের দেখা যায় বেশিরভাগ প্রফাইলে আঁকা এবং প্রত্যেকের মুখাবয়ব আলাদা স্বকীয়তায় উজ্বল। এই ছবির বিশেষ দিক হচ্ছে এর কার্পেট, জুয়েলারী,পটভূমির বাগানের দৃশ্য সব দীপ্তমান (দ্র.চিত্র-২৪) ।জাহাঙ্গীর তাঁর আত্নচরিতে তুলাদান সম্পর্কে বলেছেন:

'' আমার বাবার (আকবর) আমল থেকে বছরে দু'বার ওজন বা পরিমাপ করা হতো সোনা রূপা হীরা জহরত দিয়ে এবং সম্রাটের মঙ্গল কামনায় সেগুলো দুস্থ ও গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।একারণে আমি আমার পুত্র খুররমকে যখন তার বয়স ষোল, তখন ওজন করার নির্দেশ দেই।''[২৬]

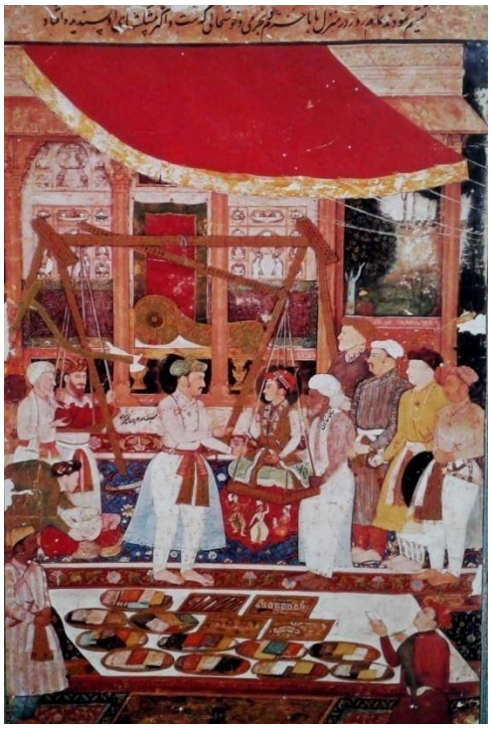

চিত্র -২৪ ,রাজকুমার খুররমের তুলাদান অনুষ্ঠান(তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরীর মিনিয়েচার চিত্র)
১৬১৫খ্রি. ২৬.৬ x ২০.৫ সি.এম. সংগৃহিত:ব্রিটিশ মিউজিয়াম লন্ডন, সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

আলো আধারীর রহস্যঘেরা ছবি অংকন মুঘল শিল্পীরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত তেমনি একটি ছবির কথা উল্লেখ প্রয়োজন আবুল হাসান অংকিত সুফি সন্তদের নাচের একটি চমৎকার ছবি আছে আমেরিকার সান দিয়েগো মিউজিয়ামের বিনি সংগ্রহশালায়। রাতের এই অনুষ্ঠানে মোমবাতি ও মশালের আলো আধারিতে দেখা যায় সিংহাসনে আসীন মুঘল সম্রাট, তাঁর সামনে পাঁচজন বয়স্ক বুমরাইয়া কেউ নাচছেন, কেউ গাইছেন। জাহাঙ্গীরের পেছনে দাঁড়িয়ে যুবরাজ খুররাম, ইতমদউদ্দৌলা, ইতিবার খান, মুকবার খান ও রাজা ভাও সিং। এ ছবিতে আবুল হাসানের দক্ষতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রং, রেখা, কম্পোজিশন সবক্ষেত্রেই এ ছবি উৎকৃষ্টতম। এ ছবিটি দেখে ইউরোপীয় মাষ্টার পেইন্টার রেমব্রান্টের কথা মনে পড়ে যায়। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন ইউরোপীয় অনেক গ্রেট পেইন্টারই তখন মুঘল চিত্র দ্বারা অনুপ্রানিত হন। বিশেষ করে রেমব্রান্টের আলো আধারের বর্ণনা তা নাকি পুরোপুরি মুঘল চিত্র থেকে অনুপ্রানিত। তবে রেমব্রান্ট **১৬৩১**সালে অমস্টারডামে বাস করতেন এবং তখনই মুঘল এলবাম চিত্র ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানির মারফত তাঁর হাতে পৌঁছেছিল।তিনি এসব রেখাচিত্র অনুকরণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

পশুপাখি, উদ্ভিদ চিত্র অংকনে জাহাঙ্গীরর সময় মুঘল চিত্রকলা উৎকর্ষতার চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। তেমনি অসংখ্য ছবির মধ্যে নাম করতে হয় **'চেনার বৃক্ষে কাঠবিড়ালী'** জনসন সংগ্রহ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী। এ ছবিতে মূল প্রতিপাদ্য কাঠবিড়ালীর স্বতস্ফুর্ত বিচরণ ও গাছের প্রতিটি পাতা অত্যন্ত সুক্ষভাবে অংকিত হয়েছে। এটি পারস্য ও ভারতীয় চিত্রকলার এক অপূর্ব সমন্বয়।আবুল হাসান অংকিত এই ছবিতে ওস্তাদ মনসুরেরও স্পর্শ ছিল। উভয়েরই স্বাক্ষরকৃত এই ছবিটিতে পরবর্তিতে ওস্তাদ মনসুর (নাদির-উল-আসর) স্বাক্ষরটি মুছে যায় (দ্র.চিত্র-২৫)।

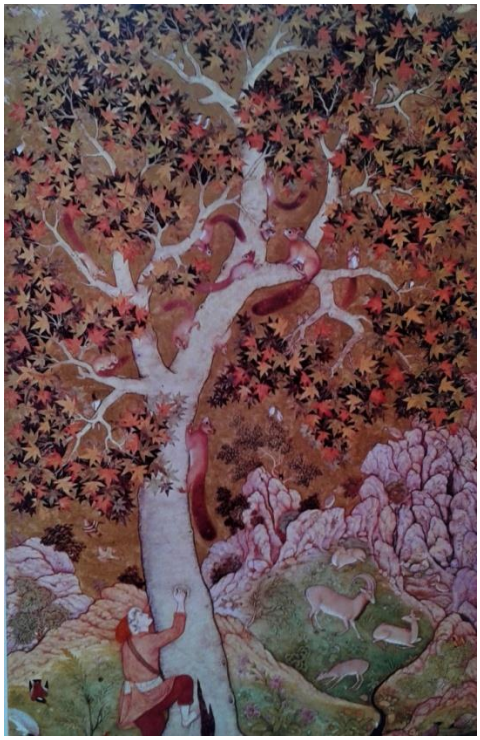

চিত্র-২৫ ,চেনার বৃক্ষে কাঠবিড়ালি,১৬১০ খ্রি:৩৬.৫ x ২২.৫সি,এম.
সংগৃহিত: ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন, সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

জাহাঙ্গীরের চিত্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয় যেমন ১৫৯৮ লাহোরের রাজ প্রাসাদের দেয়ালে কিছু খ্রিস্টান চিত্র রচনা কালে জাহাঙ্গীর নিজে তত্ত্বধান করেন এবং শিল্পীদের বলেন কোথায় কিভাবে পোশাক আশাকের ব্যবহার হবে। জাহাঙ্গীরের কারখানায় দুই প্রধান পারসিক শিল্পী আব্দুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলী মৃত্যুর পর পারস্যের ফরুক বেগ নেতৃত্বে গ্রহন করেন। জাহাঙ্গীরের দরবারে আরো দুজন পারসিক শিল্পী ছিলেন তাঁরা হলেন সমরখন্দ নিবাসি মোহাম্মদ নাদির এবং মোহাম্মদ মুরাদ। এদের দুজনেরই প্রতিকৃতি অংকনের

বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁদের দুজনেরই বিশেষ করে সিয়াহি কলম (Siyahi Qalam) বা সাদা কালোর কাজ (Black and white drawing) এ বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়।এখানে সাদাকালোর ছবির কথা উল্লেখ করতে হয় যা বাসোয়ান অংকিত **'উটের বোঝা'** (a drawing of a pack camal),size-37.6x26.5cm. ইংক এবং চারকোল ডাস্টে ১৬২০ সালে আঁকা উটের পিঠে জালানী কাঠ বেঝাইয়ের দৃশ্য। ছবিতে ইউরোপীয় ছাপচিত্রের(print) শৈলির মিশ্রণ পাওয়া যায়।ছবির কুশিলবরা ভারতীয় হলেও এর পটভূমি ইউরোপীয়।মুঘল শিল্পীদের ইউরোপীয় জেসুইট পদ্রীদের দ্বারা ফ্লেমিশ ও জার্মান এনগ্রেভিংএর পরিচয় ঘটে যার প্রকাশ পাওয়া যায় এ ছবিতে।ছবির বিশেষ দিক হচ্ছে নিম কলম (half-pen) টেকনিক বা half-tone technique যা তৎকালীন সময় বাসোয়ানের অভিনব আবিস্কার ছিল (দ্র.চিত্র-২৬)। সেই সময়ের বাসোয়ানের এ ধরনের বেশ কিছু মিশ্রিত সিরিজ ড্রইং পাওয়া যায় ।

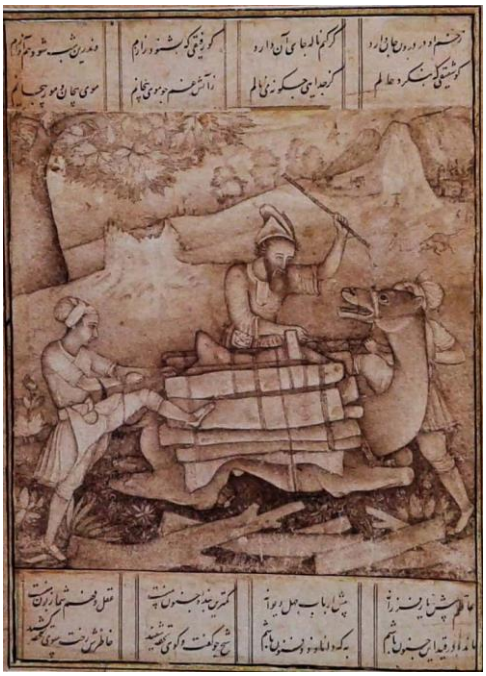

চিত্র-২৬, উটের বোঝার ড্রইং, ১৬২০ খৃ. চারকোল গুড়া, কাগজের উপর কালি ও সাথে উচ্চকিত স্বর্ণ, শিল্পী- বাসোয়ান, সাইজ-১১.৬সি.এম. x১১.৬ সি.এম. সূত্র:*পাভুল'স অকশন গ্রন্থ*

জাহাঙ্গীরের শিল্পের প্রতি সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পীমনের বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীর একটি উক্তিতে:

‘‘ চিত্রকলার প্রতি আমার অনুরাগ এবং সেগুলোর যথার্থতা বিচার এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে নাম উল্লেখ না করে যদি কোনো জীবিত অথবা মৃত চিত্রকরের কোনো শিল্পকর্ম আমার সম্মুখে আনয়ন করা হয় তা হলে আমি মুহূর্তের মধ্যে তা কোন শিল্পীর বলে দিতে পারি এবং যদি বিভিন্ন প্রতিকৃতি সম্বলিত কোনো চিত্র থাকে এবং প্রতিটি মুখাবয়ব বিভিন্ন শিল্পীর দ্বারা অংকিত করা হয় তা হলে আমি কোন মুখমন্ডল কোন চিত্রকরের দ্বারা অংকিত হয়েছে তা নির্ধারন করতে পারি। যদি কেউ মুখাবয়রের চক্ষু এবং ভুরু অংকন করেন তা হলে আমি মুখমন্ডলের প্রকৃত শিল্পী এবং পরবর্তীকালে চক্ষু ও ভুরুর শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি।’’[২৭]

এ উক্তি থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জাহাঙ্গীরের ছবির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল।মুঘল চিত্রকলায় শুধু মুল ছবি নয় হাশিয়ারও উল্লেখ করতে হয়। হাশিয়া হচ্ছে মুল ছবির বাইরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বর্ডার দেয়া। বর্তমানে চিত্র শিল্পীরা একে মাউন্ট বলে। এই হাশিয়ার মূল উৎপত্তি পারস্য থেকে ষোড়শ শতকে মুঘল চিত্রকলার এর ব্যাপক প্রচলন হয়। তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরিতে জানা যায় মুঘল দরবারে ১৫৮৪ সালে আকা রিজার আগমনের পর থেকেই হাশিয়া ও মুরক্কার (চিত্রিত অ্যালবাম) ব্যপক প্রচলন শুরু হয়। এই হাশিয়া তে অনেক নারী শিল্পীদেরও চিত্রণের খবর পাওয়া যায়। প্রথম দিকে জটিল এরাবেস্ক চিত্রিত হলেও মুঘল দরবারি চিত্রে উদ্ভিদ জীবজন্তু এবং পরবর্তীতে প্রতিকৃতির ও চিত্রণ হতে দেখা যায়। এই হাশিয়া চিত্রকর্মে মুঘল সভাসদদের একটি বিশেষ শাসক চিহ্ন হিসাবে বুৎপত্তি লাভ করে।

মুঘল চিত্রে রং এর টেকনিক হিসাবে ব্যবাহৃত হত গুয়াশ পদ্ধতি (gauache) যা জলরং এর বিশেষ পদ্ধতি একে অনেকে ঘন জলরংও বলে। সাধারণত জলরং এর দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ হতে দেখা যায় একটি স্বচ্ছ এবং আরেকটি আস্বচ্ছ। এই অস্বচ্ছ জলরংই মুঘল চিত্রে ব্যবহৃত হতো বেশি কারণএতে অনেক ডিটেইল কাজ করার সুবিধা ও অনেক কিছু মিশ্রনের সুবিধা পাওয়া যেত।যেমন মুঘল চিত্রে সোনা রূপার পাত বা সোনার জল ব্যবহৃত হত বিশেষ টেক্সচার (texture) এনে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটানো হত। রং হিসাবে বিভিন্ন পাথরচুর্ণ ও উদ্ভিজ্জ পাথর চুর্ন ব্যবাহৃত হত। নীল ব্যাবহৃত হত ‘ল্যপিজ লাজুলি’ পাথর থেকে যা রয়েল ব্লু হিসাবে খ্যাত। ছবির জমিন হিসাবে ব্যবাহৃত হত কাগজ বা কাপড়। প্রথম দিকে কাগজ পারস্য থেকে আনা হত। পরে ভারতেই কাগজ তৈরী হতে থাকে। সেই সময়কার বিভিন্ন কাগজের নাম পাওয়া যায় যেমন- শিয়ালকোটি কাগজ পঞ্জাবের শিয়াল কোটে তৈরী করা হত, তুলোট কাগজ যা তুলা থেকে উৎপন্ন হত, পাট থেকে একধরনের কাগজ তৈরী হত তাকে বলা হত টাটহা এছাড়াও ইরানি ও ইসাপাহানি নামক দুটি বিদেশী কাগজও পাওয়া যেত। তবে শুরু থেকেই মুসলীম চিত্রকলায় কাগজের ব্যাবহার দেখা

যায় এবং ছবির কম্পোজিশান চতুর্দশ শতক থেকে উলম্ব(vertical) হতে থাকে।এই উলম্ব মুসলীম শাসণ দন্ডের প্রতিক হিসাবে গন্য করা হত।উপযুক্ত তুলি তৈরী হত পশুর লোম থেকে যেমনঃ কাঠবেড়ালী, বেজী, ছাগল, উট ইত্যাদি থেকে তুলি তৈরী হত।একটি লোমের তৈরী (একবাল কলম) ব্যাবহৃত হত সুক্ষ কাজ করার জন্য। ছবিতে নানারকম পাথরচুর্নাও ব্যবহার করা হতো। একে বলা হত জারা করা। প্রথমে রেখা অংকন করে তারপর স্তরের উপর স্তরে রং লাগিয়ে মুঘল চিত্র সম্পন্ন করা হত। শেষে করা হত outline বা বহিরেখা বা অন্যত্র texture ঘটিয়ে সৈন্দর্য বৃদ্ধি ঘটানো হতো। মুঘল চিত্রে মানুষ্য অবয়বে শ্রেনীভেদ প্রথা দেখা যায়। যেমন- বাদশাহের ক্ষেত্রে গৌরবর্ন, ভৃত্যের জন্য তামাটে রং এবং হাবশির জন্য কালো রং।যেহেতু মুঘল চিত্রকলা পান্ডুলিপি এবং মুরাক্কা বা অ্যালবামের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এটা হাতে নিয়ে দেখতে হয় তাই মুঘল চিত্রকলা গুয়াশ পদ্ধতি হওয়াই বাঞ্চনীয়। কারণ এই পদ্ধতিতে সুক্ষ তুলির চালনায় অতি ডিটেইল কাজ করা যায়। আবার রং এর স্তরও তৈরী করা যায়। মুঘল সম্রাট বাদশাহরা চিত্রকলা পান্ডুলিপি এবং মুরাক্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে সপ্তদশ শতকে মুঘল চিত্রকলা চরম উন্নতিতে আরোহণ করে তা সম্ভব হয় জাহাঙ্গীরের মননশীলতার কারণে তার ২২ বৎসরের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলা শুধু ভারতে নয় ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। অনেক পন্ডিতই বলে থাকেন মুঘল শি্ল্পীরা যেমন সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় শিল্প দ্বার অনুপ্রাণিত হন অনুরূপ শুধু ইউরেপয় শিল্পী শুধু রেমব্রন্ট নন ইউরোপীয় অনেক শিল্পী যেমন- অ হালব্রেক্ট ডুরার, হলবিন এরকম অনেক শিল্পীই মুঘল চিত্রদ্বারা অনুপ্রানিত হন।

তথ্যসূত্রঃ

১.মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ***শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত***, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,২০১১, পৃ ৮৬

২.মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯

৩.অশোক ভট্টাচার্য,***বাংলার চিত্রকলা***, কলকাতা: পশ্চিম বঙ্গ বাংলা একাদেমী,২০১০,পৃ ১৬

৪.নীহাররঞ্জন রায়***, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,*** কলকাতা:দে'জ পাবলিশিং,২০০৭,পৃ ৬৬৬

৫.মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত,প্রাগুক্ত, পৃ ৩১

৬ ।পারুল ঘোষ, ***বাংলার বৈষ্ণবধর্ম সাহিত্যে ও দর্শনে*** ,কলকাতা:করুণা প্রকাশনী,শ্রাবণ ১৩৮৬, পৃ ৮

৭.অশোক ভট্টাচার্য,প্রাগুক্ত,পৃ ৪৪

৮.সৈয়দ আবদুল অয়াজেদ,***বাংলাদেশের পুস্তকের প্রচ্ছদ,খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রের ব্যাখ্যাকর শোভাবর্ধন চিত্র ও অলংকরণ: এর ধারাবাহিকতা ও বিবর্তন,*** চ.বি: পি.এইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ,২০১৫, পৃ ৭৩

৯.স্বাতী দাস সরকার,***বাংলার পুথি বাংলার সংস্কৃতি***,কলকাতা:সাহিত্যলোক,১৯৯৮,পৃ ৬৫

১০.সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,***মুসলিম চিত্রকলা***, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স,২০১০,পৃ ২০

১১. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত,প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯

১২.এ বি এম হোসেন,***ইসলামী চিত্রকলা***,ঢাকা:খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি,২০১০,পৃ ১১০

১৩.এ বি এম হোসেন,প্রাগুক্ত,পৃ ১১০

১৪.সৈয়দ আলী আহসান,***শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য,*** ঢাকা:বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী,১৯৯৩,পৃ ৬৮

১৫. এ বি এম হোসেন,প্রাগুক্ত,পৃ ১২১

১৬.মাহমুদুল হাসান,প্রাগুক্ত,পৃ ২৯২

১৭. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত,প্রাগুক্ত, পৃ ১০০

১৮.রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়,***দরবারি শিল্পের স্বরূপ মুঘল চিত্রকলা***, কলিকাতা:থীমা,১৯৯৯, পৃ ২৩

১৯. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত,প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩

২০.এ কে এম খাদেমুল হক,মাহমুদা খানম, ঢাকা:বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, আটত্রিশ বর্ষ,১ম-৩য় সংখ্যা১৪১১,পৃ ১০২

২১.সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,প্রাগুক্ত,পৃ ২৯৪

২২. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,প্রাগুক্ত,পৃ ৩১৮

২৩.Najma Khan Majlis,***Women painter During the Time of Emperor Jahangir (1605-1627AD)*** Dhaka: Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,Vol.XXXI,No-2,December 1986,p51

২৪.Najma Khan Majlis,Ibid,p52

২৫.রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়,প্রাগুক্ত,পৃ ৭৫

২৬.নাজমা খান মজলিস,***মুঘল চিত্রকলায় তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপায়ন,*** ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ,ড.নাজিমুদ্দীন আহম্মেদ স্মারক বক্তৃতা,২৯ মার্চ ২০১৭,পৃ ২৫

২৭.সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,প্রাগুক্ত,পৃ ৩২১

তৃতীয় অধ্যায়

৩.মুঘল চিত্রকলার পতন ও প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার বিকাশ

৩.১ শাহজাহানের সময়কালে মুঘল চিত্রকলা

শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি:) সময়কালে মুঘল চিত্রকলা কিছুটা স্থিমিত হয়ে আসে। এর বিশেষ কারণ হল শাহজাহানের স্থাপত্যের উপর বিশেষ আগ্রহের ফলে। শাহজাহান ইন্দো পারস্য স্থাপত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটান যা ভারতীয় স্থাপত্য কলাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। দিল্লী দুর্গ, দেওয়ান-ই-আম, মোতি মসজিদ, তাজমহল ইত্যাদি ছাড়াও ময়ুর সিংহাসন শাহজাহানের এক অনন্য কীর্তি। এই ময়ুর সিংহাসন তৈরী করতে তিনি ফরাসী শিল্পী লা গ্রেঞ্জকে (la grange) কে দায়িত্ব দেন।[১] এই ময়ুর সিংহাসন deco শিল্পের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে শাহজাহান ছবির প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ছিল এমনটি মনে হয় না। সেই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে শাহজাহান যখন রাজকুমার খুররাম নামে পরিচিত যখন তিনি শাহজাহান হয়ে উঠেননি তখন দরবারে আগত স্যার টমাস রো তাকে একটি ছোট রূপার ঘড়ি উপহার দিতে চাইলে পিতার (জাহাঙ্গীর) ন্যায় বলেন, ''এর বদলে একটি ইউরোপীয় চিত্র পেলে খুশি হতেন।''[২] শাহজাহান পরবর্তীতে সিংহাসন আরোহণ করলে বড় বড় শিল্পী রেখে কিছু শিল্পী ছাটাই করে দেন। এই কারণে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন শাহজাহানের সময় মুঘল চিত্রকলার জৌলুষ কমে যায়। এর বিশেষ কারণ শাহজাহনের স্থাপত্যের উপর ব্যায়ভার বেড়ে যাওয়া বলে অনেকে মনে করেন। তবে শাহজাহনের সময় মুঘল মিনিয়েচারের ক্ষেত্রে কিছুটা নতুনত্ব আসে যেমন-ছবির 'বর্ডার' বা 'হাশিয়ার' ক্ষেত্রে রঙিন ফুল,প্রজাপতি,কীট-পতঙ্গ এমন কি কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চিত্রায়ণ হতে দেখা যায়। তেমনি একটি ছবির উদাহরন হচ্ছে সম্রাট **'শাহজাহান দারাশিকোকে গ্রহণ করছেন'** আনুমানিক ছবিটি ১৬৫০ সালের দিকে আঁকা।বর্তমানে ছবিটি লস এঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়ামে সংগৃহিত আছে।ছবিটি মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রের একটি উৎকৃস্ট উদাহরন।ছবিতে দেখা যায় সম্রাট সুন্দর কারুকার্যময় চেয়ারে উপবিস্ট তাঁর সামনে করোজোরে দন্ডায়মান যুবরাজ দারাশিকো যে নিজেকে সম্রাটের কাছে সমর্পন করছেন ।তাঁদের পাশে দুজন সভাসদ দন্ডায়মান ।ছবির পশ্চাতপটে বিস্তৃত আকাশ ছবির ফিগারগুলিকে বিশালত্ব করে তুলেছে।ছবির বিশেষ দিক হচ্ছে এর পোশাক পরিচ্ছদ, জুয়েলারি,কার্পেট চমৎকর নকশা দ্বারা সজ্জিত।এর বর্ডার বা হাশিয়াতেও দেখা যায় ফুল, লতা-পাতা ছাড়াও বিচিত্রসব পাখি অংকন হতে (দ্র.চিত্র-২৭)

তৎকালীন সময় দরবারি শিল্পীদের ছাটাই করার ফলে দেখা যায় শিল্পীরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে জীবিকার সন্ধানে। আগে শুধু চিত্রকলা দরবারের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর রস আস্বাদন করত শুধু রাজা, বাদশাহ, আমীর, ওমরাহগন। শিল্পীরা ছাটাই হবার ফলে দরবার থেকে বেরিয়ে বাজারে পসরা সাজিয়ে বসে ফলে চিত্রকলা mass people এর সান্নিধ্যে আসে অর্থাৎ জনশিল্পে পরিনত হয়।

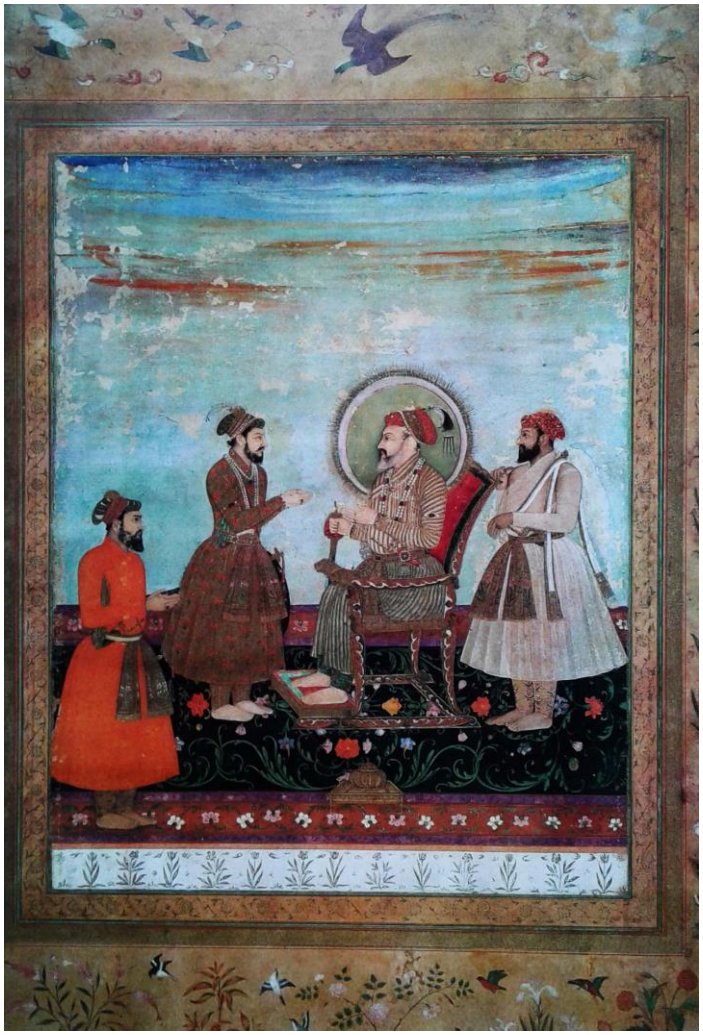

চিত্র-২৭,শাহজাহান দারাশিকোকে গ্রহন করছেন,১৬৫০ খ্রি.মাপ-৩৭.২সিএম x ২৫.৪ সি.এম.সংগ্রিহিত: লসএঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অব আর্ট,সূত্র:ললিতকলা একাডেমী পোর্টফোলিও

ফরাসি চিকিৎসক ও পর্যটক বার্নিয়ার ১৬৫৬ থেকে ১৬৬৮ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে ভ্রমন করেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর চিত্রকর ও কারুশিল্পীদের একটি সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন :

''একটি ঘরে ফুলকারীর কাজ হইতেছে, একজন তত্ত্বধায়ন তাহা পরিদর্শন করিতেছেন, আর এক ঘরে স্বর্ণকারেরা কাজ করিতেছেন, তৃতীয় ঘরে আছেন চিত্রকারেরা।'' ৩

অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সময় ক্রেতার চাহিদা অনুসারে অতি মাত্রায় production বা পন্য তৈরী করা হতো।সেই সময়কার চিত্র শিল্পীদের হাল হকিকত এবং সামাজিক অবস্থা আরো জানা যায় বার্নিয়ারের তথ্য থেকে , তিনি বলেন:

'' প্রকৃত সমাঝদারের অভাবে চিত্রকর ও কারিগরদের দারিদ্রের সংগে যুঝিতে হইয়াছে। ভালো চিত্রকর ও কারিগরদের যে অভাব ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা ও দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পান নাই। ওমরাহরা বাজারে সস্তাদরের জিনিস চাহিয়াছেন, এমনকি তাঁহাদের খামখেয়ালির জন্য শিল্পী ও ব্যাবসায়ীদের বেত্রাঘাত পাইতে হইয়াছে। তাঁহাদের দরজায় কোড়া নামক চাবুক সর্বদা টাঙ্গানো থাকিত। ''৪

এ থেকে প্রতীয়মান হয় একদিকে আমীর ওমরাহদের তাচ্ছিল্য অন্যদিকে জীবিকার সন্ধানে শিল্পীদেরকে বাজারে নামতে হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে মুঘল চিত্রকলা দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী হয়েছিল এবং মাল মশলার যোগান রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকেই হত। ফলে বাজারে নামার ফলে সস্তা দরের উপাদান মুঘল চিত্রে মিশতে থাকে এবং অতি মাত্রায় ছবির যোগান দেয়ার জন্য অনেক ভুঁইফোড় শিল্পীর আবির্ভাব হয়। বার্নিয়ার এদেরকে বাজার শিল্পী আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের উঁচু দরের ছবি অংকন করার চেয়ে জনপ্রিয় ছবির নকল করতেই বেশি দেখা যায়। এসব ভুঁইফোড় শিল্পীদের কাছে সবসময় পাতলা কাগজের ট্রেসিং থাকত। প্রয়োজন মতো বিক্রির জন্য এক চিত্রের বহু নকল করতেন। শাহজানের সময় চিত্রের মধ্যে সোনালী রং এর আধিক্য বেড়ে যায়। হয়ত ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য এমনটি হয়ে থাকবে। অধক্ষ্য নকল নবীশ শিল্পীদের দ্বারা চিত্রের বিপর্যয় ঘটে যেমন প্রানীচিত্রের কিম্ভুত কিমাকার আকার দেখা যায়।

শাহজাহনের সময় মুঘল চিত্রের উপরে বিপর্যয় নেমে আসে আরেকটি কারন ইউরোপীয়দের আগমন মাত্রাতিরিক্ত তখন বেড়ে যায়। ফলে চিত্রে তার প্রভাব পড়তে থাকে। সেই সময় ইউরোপীয় ছবির আলোছায়া, এরিয়াল পার্সপেক্টিভ, চিত্রে মধ্যম আভা ঘটানো ইত্যাদি অতিমাত্রায় মুঘল চিত্রে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে । অনুরূপ একটি ছবির বর্ননা দিলে ব্যাপারটি স্পস্ট হয়ে উঠবে যেমন **'সেবক পরিবেস্টিত বিছানার উপর শায়িত যুবরাজ'** ছবিটির কথা বলা যেতে পারে। ১৬৪০ সালের দিকে শিল্পী পয়াগের আঁকা এ ছবিতে দেখা যায় শায়িত যুবরাজের চারিদিকে পুরুষ পরিচারক সেবায় ব্যাস্ত।কেউ যুবরাজের পা টিপে

দিচ্ছে,কেউ বাতাস করছে ,কেউ আবার পানীয় পরিবেশন করছে।ছবিটি জাহাঙ্গীরের সময়কার প্রতিকৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয় তবে ছবিটির বিশেষ দিক হচ্ছে ছবিতে ফিগারগুলিতে ত্রিমাত্রিক ভাব আনার জন্য উচ্চকিত রং (high light) প্রয়োগ।আলোছায়া (chiaroscuro) যা ইউরোপীয় রেনেসাঁসএর ছবিতে প্রয়োগ হতে দেখি এবং যা দিয়ে ছবিতে ত্রিমাত্রিকতা ঘটানো হতো। সেই ইউরোপীয় আলোছায়ার অনুকরণ এ ছবিতে লক্ষ্য করা যায় ।যদিও মুঘল ছবির ঘরানা দিমাত্রিক।ছবিটিতে রং দিয়ে ফিগারগুলিতে high light প্রয়োগ করলেও ছবির পটভূমি,পোষাক পরিচ্ছদ দিমাত্রিকতারই নির্দেশ দেয় (দ্র.চিত্র-২৮) ।তৎকালীন শাহজাহানের সময় অদক্ষ্য নকলনবীশ শিল্পীদের দ্বারা চিত্র চর্চার ফলে চিত্রে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বিপর্যয় ঘটতে থাকে। পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পীদের দরবারে উপস্থিত হবার কথাও শোনা যায়। যেমন-শিল্পী মোহম্মদ জামানের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পারস্যের সুলতান শাহ আব্বাস (১৬৪২-৬৭ খ্রি.) কয়েকজন পারস্য শিল্পীকে ইউরোপের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে শিল্প শিক্ষা গ্রহনের জন্য পাঠান এবং এই বৃত্তিধারীদের মধ্যে মোহাম্মদ জামানও ছিলেন। তিনি ইউরোপে থাকাকালীন কোনো এক সময় ইউরোপীয় মেয়েকে বিয়ে করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করেন এবং পল জামান নাম ধারন করেন। তিনি শিল্প শিক্ষা গ্রহন করে পারস্যের শাহ আব্বাসের দরবারে ফিরে এলে দরবার থেকে তাকে প্রত্যাখান করা হয়। পরবর্তীতে তিনি মুঘল দরবারে আশ্রয় গ্রহন করেন। তাঁর চিত্র পদ্ধতি ছিল ইউরোপীয় ঘরানার মুঘল সংস্করন। পন্ডিত পার্সি ব্রাউন তাঁর চিত্রাবলীকে রাফায়েলের প্রতিফলন বলে আখ্যা দেন।

চিত্র-২৮,সেবক পরিবেস্টিত বিছানার উপর শায়িত যুবরাজ,১৬৪০ খ্রি.মাপ-২৬.৫ x ৩৭ .সে.মি.সংগৃহিত: মিত্তাল মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট ,হায়দারাবাদ,সূত্র-পান্ডুল'স অকশন গ্রন্থ

পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে শাহজাহানের চিত্র অপেক্ষা স্থাপত্যের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। তিনি ইন্দো-পারস্য স্থাপত্যের এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটান। তিনি স্থাপত্যের অলংকরণের মতই চিত্রে জাকজমক, চাকচিক্য, আড়ম্বরের প্রতিফলন ঘটান। স্থাপত্যের 'পিয়েত্রা ডুরার' মত ছবিতে পোষাক - আশাক, কার্পেট, দেয়াল গাত্রে নকশার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ফ্রীয়ার গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট,স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট ,ওয়াশিংটনে ও ফগ আর্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত উক্ত *'শাহজাহান নামা'* পান্ডুলিপির উদাহরন টানা যেতে পারে । শাহজাহানের দরবার দৃশ্যের একটি ছবিতে দখা যায় তিনটি প্যানেলের মত ভাগ করা। এই তিন ভাগ করা কম্পোজিশান মুঘল ছবির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য অধিকার করে আছে।এখানে শ্রেণী হিসাবে ফিগারগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে যা পূর্বে ভারতীয়,মিশরীয় ছবিতে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ উপরিভাগে থাকবে রাজা-বাদশাহরা, দ্বিতীয়ভাগে থাকবে আমির ওমরাহরা এবং তৃতীয়ভাগে থাকবে আমজনতারা।তদ্রূপ এ ছবিতে উপরিভাগে সম্রাট শাহজাহানের দরবার, মধ্যভাগে দরবারের আমাত্যগন নীচে আম জনতা শাহজাহানের দুপাশে দন্ডায়নের অবস্থায় দেখা যাচ্ছে দু জন পরিচালক পাখা হাতে। দেওয়ান-ই-আমের অলংকরন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সম্ভবত ছবিটি মুরাদের আঁকা ১৬৫০-৫৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে । অত্যান্ত সুন্দর কারুকার্যময় সিংহাসনে উপবিষ্ট শাহজাহানের পেছনে প্রিয় ছেলে দারা শিকো বসা এবং তাঁর মাথার পিছনে তাঁকে মহান করতে হ্যালো অংকিত হয়েছে(দ্র. চিত্র-২৯)।

শাহজাহানের জৈষ্টপুত্র দারাশিকোর উপর সুনজর ছিলো সম্রাটের। দারাশিকো প্রপিতামহ (আকবরের) ন্যায় চিত্রকলা ভালবাসিতেন। দারাশিকোর মুরাক্কা বা এ্যালবামে অত্যান্ত সুন্দর মিনিয়েচার অংকিত ছিল। তার চিত্রের সংগ্রহ ছিলো বিশাল। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আকবরের ন্যায় তিনি উপনিষদের পারস্য অনুবাদ করতে নির্দেশ দেন। এই উদার মনোবৃত্তির কারনে দারাশিকোর তাঁর কনিষ্ট ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের হাতে সিন্ধুর মরুভূমিতে পলায়ন কালে স্ত্রীসহ মৃত্যুবরন করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন শাহজাহানের পরবর্তীতে দারাশিকো মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করলে মুঘল যুগ এত তাড়াতাড়ি অস্তমিত হত না।

শাহজাহানের সময়কার চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় মাত্রাতিরিক্ত চাকচিক্য, জাকজমক এবং কারুকলায় পর্যবসিত। যেহেতু শিল্পীগন বাজার মুখী হয়ে ওঠে ফলে ক্রেতা আকর্ষনের উপলক্ষ্যে রংএর জৌলুষ বাড়াতে থাকে আর এটা সত্য যে অতিমাত্রায় বাজার মুখী হলে ছবির মানের অধোপতন ঘটা স্বাভাবিক। পার্সি ব্রাউনের উক্তিটি এখানে প্রনিধানযোগ্য: "মুঘল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যাধিক উজ্জল রং এর

কারণে বিলুপ্ত হতে থাকে"৫ অর্থাৎ এতে বোঝা যায়, মুঘল চিত্রকলার আড়ম্বরতা মত্রাধিক স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ব্যবহার বাড়তে থাকে। শোনা যায় শাহজাহান নিজেও জাকজমক আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময় মুঘল চিত্রের যে পেলবতা ও নমনীয়তা তা শাহজাহানের সময় লোপ পায়।

চিত্র-২৯ক,খ

চিত্র -২৯, ক,খ-শাহজাহাননামা (শাহজাহান ধর্মীয় অনুসারীদের দরবারে সম্মান জ্ঞাপন করছেন)১৬৫০-১৬৫৩ খ্রি. ৩৫.১ x২৪.২ সে.মি.৩৪.৩ x ২৩.৯ সে.মি.প্রথম ছবিটি ফ্রিয়ার গ্যালারী অব মডার্ন আর্ট ,স্মিতসোনিয়াম ইনস্টিটিউটে সংগৃহিত ,দ্বিতীয় ছবিটি ফগ আর্ট মিউজিয়ামে সংগৃহিত,সূত্র:*ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং গ্রন্থ*

৩.১. শাহজাহান পরবর্তী মুঘল চিত্রকলা

শাহজাহান পরবর্তী মুঘল সম্রাট হন আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)। আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে মুঘল দরবারি চিত্রকলার চর্চা ভাটা পড়ে। তবে শাহজাহানের সময় থেকেই মুঘল চিত্রকলার অস্থ যুগ শুরু। আওরঙ্গজেব শুধু চিত্র নয় সংগীতের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। শোনা যায় ওমরাহরা নাকি

সেই সময় গোপনে সংগীত শুনতেন। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিস্থলে যে মানুষের মূর্তি অংকিত ছিল তাতে আওরঙ্গজেব চুনকালি লেপে দেয়। বিজাপুরের প্রতিকৃতি চিত্রও তিনি নাকি নিজ হাতে মুছে দেন। তবে মুঘল চিত্রের ঝাপ একেবারে যে বন্ধ হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় আওরঙ্গজেবের সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা থেকে আওরঙ্গজেবের জৈষ্ট পুত্র মুহাম্মদ সুলতান বিদ্রোহী হালে তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে রাখেন। তবে সম্রাটের আদেশে ছবি এঁকে নাঝে মাঝে তাঁকে দেখানো হত। এ থেকে বোঝা যায় সম্রাটের সময় ছবি আঁকা চালু ছিল। তবে দেখা যায় অধিকাংশ ছবিই মানহীন।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে মুঘল চিত্র যুগ প্রায় শেষ হয়ে যায় এবং সেই সাথে ভারতের পূর্ণ মুঘল শাসনের যুগও প্রায় অস্তমিত হয়ে আসে। তবে আওরঙ্গজেবের সময় প্রতিকৃতি ও দক্ষিনাত্য (বিজাপুর) জয়ের বেশ কিছু চিত্রের খবর পাওয়া যায়। মনে হয় অ্যালবামের জন্য করা। তবে শিল্পী বিচিত্রের আঁকা দুটো ছবির উল্লেখ করতে হয় যেখানে মুঘল রাজশক্তির শেষ দেখা মেলে। একটি **'দরবার অব আলমগির'** (আলমগিরের দরবার হল)১৯.১ x ২১. ৪ সে.মি. যা ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। সম্ভবত ১৬৫৮ সালে আঁকা। এখানে দেখা যায় আলমগীর দরবারের আমাত্যদের নিয়ে কারুকাজ ঘঠিত বর্গাকার সিংহাসন বসে আছেন। বাহারি চাঁদোয়া টাঁঙ্গানো ডান হাতে বাজ পাখি ধরা, সম্রাটের সামনে তাঁর তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজম দাঁড়ানো বালকসূলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বাম পাশে শায়েস্তা খান দাঁড়ানো। সম্রাটের মাথার পেছনে গোলাকৃতি হ্যালো দেখা যায়। সমস্ত ছবিতে সোনালী রং এর আধিক্য। অতিরিক্ত কারুকার্যময় এই ছবি যা শাহাজাহানের সময়কার ছবির কথাই মনে করিয়ে দেয় (দ্র.চিত্র-৩০)।

আরেকটি ছবির কথা না বললেই নয় **'আলমগিরের নিলগীই শিকার'** । বিচিত্রের আঁকা ১৬৬০ সালে ২৩.৭ সেমি ৩৯.৪ সেমি বর্তমানে এটি ডাবলিনের চেষ্টার বেটি লাইব্রেরীতে সংগৃহিত। চারদিকে ঘন ঝোপের ভিতর নিলগাইয়ের বিচরন। ঘন ঝোপের পাতাগুলো খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। সম্রাট মাদুরের উপর বসে বন্দুক তাক করে আছেন দুজন আমাত্যর মাঝখানে আমাত্য দুজন নকল ঝোপ তৈরী করে সামনে বসে আছে।

চিত্র -৩০, আলমগিরের দরবার,১৬৫৮ খ্রি.মাপ- ১৯.১ x ২১. ৪ সে.মি.ব্যাক্তিগত সংগ্রহ,
সূত্র:ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং

দূরে একটি নিলগাই গুলিবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। দুরে হাতি ঘোড়া বাধা সমস্ত ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত খুব সুন্দর ভাবে ফুঁটে উঠেছে। যা দেখে ইউরোপীয় ছবির কথা মনে পড়ে যায় (দ্র.চিত্র-৩১)

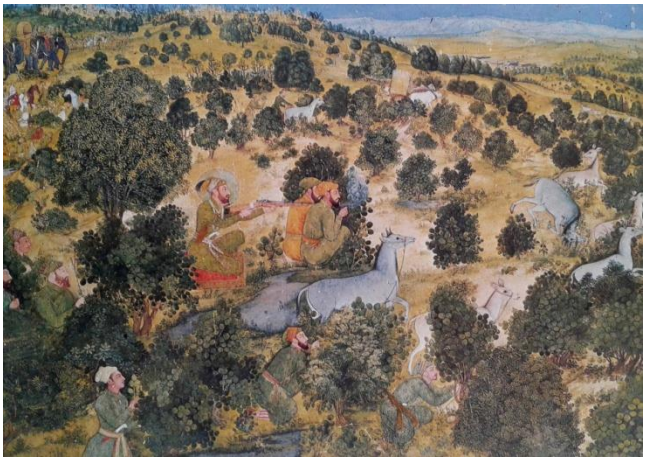

চিত্র- ৩১,আলমগিরের নিলগাই শিকার ,১৬৬০ খ্রি. মাপ- ২৩.৭ x ৩৯. ৪ সে.মি.সংগৃহিত: চেস্টার বিটি লাইব্রেরি, ডাবলিন
সূত্র: ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরপরই মুঘল ইতিহাসের দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে সম্রাট হন। ১৭১২ সালে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে জাহান্দরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাইপো ফররুখশিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রি.) সম্রাট হন। এই সময়ে মুঘল চিত্রকলার পুনর্জাগরনের কোন হদিস না পাওয়া গেলেও কিছু প্রতিকৃতি চিত্রের খবর পাওয়া যায়। ১৭১৯ সালে ফররুখ সিংহাসনচ্যুত হলে মুঘল বাদশা হন মুহাম্মদ শাহ রঙ্গিলা (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.)। তাঁর অতিরিক্ত সাজপোষাক, অলংকরণ ও মাত্রাতিরিক্ত খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য লোকজন তাকে রঙ্গিলা হিসাবে আখ্যা দিয়েছিল। মুহাম্মদ শাহের চিত্রের প্রতি আগ্রহের ফলে তৎকালিন সময়ে মুঘল চিত্ররীতি কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়। তাঁর সময়ের একটি চিত্র বিশ্লেষণ করলে মুঘল চিত্রকালার সেই সময়কার স্বরূপ উদঘাটিত হয়। ছবিটি হচ্ছে **'মুহাম্মদ শাহের বাগান দর্শন'**। পূর্বের মুঘল বাদশাহদের মত মুহম্মদ শাহ চিত্র,বাগান,নৃত্য,গান ভালবাসতেন।আ: ১৭৩০-৪০ সালের দিকে করা, ৩৮.৩ সে.মি ৪২.৫ সে.মি. মাপের ছবিতে দেখা যায় বাদশাহ রাজকীয় গদিতে পালকিতে চড়ে বাগান দর্শনে যাচ্ছেন। হাতে রাজশক্তির প্রতীক বাজপাখি অংকিত। গদিটি চারজন ভৃত্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পূর্বের মুঘল চিত্রের মত স্থপত্যের অংকনে নকশার কাজ দেখা যায়। ছবির পাশ্চাদে সাদার প্রাদুর্ভাব বেশি এবং কুন্ডলিকৃত মেঘের আড়ালে সোনালি আকাশ বেশি চোখে পড়ে। সাদার বিপরীতে ফুলের গাছের নকশা স্পষ্ট। মনে হয় ছবিটি পাতলা প্রলেপের আস্তরনে অংকিত যা বর্তমান সময়ে রিক্রা পেইন্টিং এর কথা মনে করিয়ে দেয় (দ্র.চিত্র-৩২)। সমস্ত দিক বিবেচনা করলে ছবিতে মুঘল সংস্কৃতির অস্তরাগের কথাই প্রতিফলিত হয়।

প্রদীপের শিখা যেমন নি:শেষ হওয়ার আগে দপ করে জ্বলে উঠে ঠিক মুঘল চিত্রকলা মুহাম্মদ শাহর সময় জ্বলে উঠার সুযোগ পেলেও তা শেষ রক্ষা হয়নি। ১৭৩৯ সালে পারস্যের নাদির শাহের দিল্লী আক্রমন ও লুণ্ঠনের ফলে মুঘল চিত্রকলার ঝাপি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।[৬] ঐ দিকে প্রদেশিক রাজ্যগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করলে শিল্পীরা কাজের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় হয়ত গোবর্ধনই কারখানার প্রধান শিল্পী ছিলেন।

চিত্র - ৩২,মুহাম্মদ শাহের বাগান দর্শন ,১৭৩০-৪০খ্রি.মাপ-৩৮.৩ x ৪২.৫ সে.মি,সংগৃহিত:মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস, বোস্টন,সূত্র: *ইম্পেরিয়াল মুঘল পেইন্টিং*

৩.৪ প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব ও বিকাশ

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়দের একদিকে আগ্রাসন অন্যদিকে নাদির শাহের লুটতরাজে দিল্লী বিদ্ধস্ত হলে, প্রাদেশিক রাজ্যগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অযোধ্যা, দক্ষিনাত্য, মুরশিদাবাদ ইত্যাদি প্রদেশের নবাবরা স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। সেই মোতাবেক মুঘল শিল্পীরা কাজের সন্ধানে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই 'কলম' শব্দের উৎপত্তি হয়। এই শব্দটি সাধরণত 'স্কুল' বা 'ঘরানার' প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যাবহৃত হতে থাকে। যেমন লক্ষ্মৌ কলম বা আযোধ্যা (আউধ) কলম। দক্ষিনাত্য (ডেকান) কলম, মুর্শিদাবাদ কলম ও বাংলা কলম ইত্যাদি। অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্মৌতে মুঘল দরবারি শিল্পীদের অনেকরই নাম পাওয়া যায় যেমন- হুনহার, মিশকিন, পাটক চাঁদ, উত্তম চাঁদ, জগন্নাত, মুহাম্মদ আফজাল, মীর কালান খান, মিহির চাঁদ, গোবিন্দ সিং, মোহন সিং, গোলাম রিজা, শীতল দাস প্রমুখ। শোনা যায় অযোধ্যাতে নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও অন্যান্য ব্যাক্তি মালিকানাধীন শিল্পের কারখানা ও বাজার গড়ে ওঠে। ক্রেতার চাহিদা মাফিক বিভিন্ন প্রতিকৃতি, রাগরাগিনী, সাধরণ দৃশ্য তখন অংকিত হত।

মুর্শিদাবাদে মুঘলদের প্রাদেশিক কর্মকান্ডের বুনিয়াদের ভিত্তি মুর্শিদকুলি খান দ্বারা শুরু হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০৩-১৭২৭খ্রি.)গোড়া ধার্মিক ছিলেন বিধায় চিত্রকলায় তেমন উৎকর্ষতা পাওয়া যায় না তবে চিত্র শিল্পের করুন হাল হয়েছিল বলে জানা যায়। খাজা খিজির উপলক্ষ্যে চিত্র শিল্পীদের লণ্ঠনের কাজে নিযুক্ত হওয়ারও খবরও পাওয়া যায়। সারা মুর্শিদাবাদ এমনকি ভাগীরথীর পশ্চিম পার পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হত সেই কারণে লণ্ঠনে কোরআন এর উদ্ধিতি, মসজিদ, লতাবৃক্ষ দিয়ে সজ্জিত করা হত। প্রায় এক লক্ষ লোক এই নগর সাজাতে কাজ করত বলে শোনা যায়। ভাগীরথী নদীর উপর প্রদীপ ভাসানো বেড়া উৎসবও বেশ জমকালো ছিলো। ১৭০৪ সালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে ঢাকা থেকে রাজধানি স্থানান্তরিত করার ফলে মুর্শিদাবাদ হয়ে উঠে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কেন্দ্রভূমি। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে চিত্র চর্চার খবর পাওয়া না গেলেও তাঁর মৃত্যুর পর আলবর্দি খাঁ ১৭৪০ সালে নবাব হলে তখন কিছু মিনিয়েচার চিত্রের খবর পাওয়া যায় এবং তাঁর সময় চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়।পরবর্তীতে তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রি.)নবাব হলে চিত্রকলার জৌলুষ বেড়ে যায়।সেই সময় কিছু রাগমালা চিত্রেরও খবর পাওয়া যায় যা ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংগৃহীত। এই চিত্রগুলোকেই মুর্শিদাবাদ কলম হিসাবে অভিহিত করা হয়। সেই সময়কার একটি ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা মুঘল শৈলীরই অপভ্রংশ বলে দাবি করা যায় **'আলিবর্দি খাঁর শিকার দৃশ্য'** আনুমানিক (১৭৫০খ্রি.) সম্ভবত শিল্পী দ্বীপ চাঁদ অংকিত। ছবিটি অত্যন্ত মনোরম। আলিবর্দি খাঁ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা দিয়ে হরিণ শিকার করছে পেছনে রাজকর্মচারী কুকুর নিয়ে দাড়ানো হয়ত হরিণ তাড়ানোর জন্য। মাঝখানে বালিয়াড়ি নদী তাঁর ওপর পারে দুই ভৃত্য হরিণ আটকাতে ব্যাস্ত । এ কাজে রং এর ব্যবহারের পরিমিতি বোধ পাওয়া যায়। পেছনের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম (দ্র.চিত্র-৩৩)।

চিত্র -৩৩,আলিবর্দি খাঁর শিকার দৃশ্য, আ.১৭৫০ খ্রি.সূত্র:*এশিয়াটিক সোসাইটির চারুকারুকলা গ্রন্থ*

রংএর ব্যাবহারে শীতল আমেজে শীতকালের ভাব ফুটে উঠেছে । নবাব নাকি প্রতি বছর শীতকালে শিকার করতে যেতেন। আরেকটি ছবির কথা বলা যেতে পারে যাতে নবাবের প্রাত্যহিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। **'সপার্ষদ নবাব আলিবর্দি খাঁ'** মুর্শিদাবাদ (আ. ১৭৫০ খ্রি.) নবাবের দরবার দৃশ্য। ছবিটি বর্তমানে ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সংগৃহিত। ছবিটিতে মুঘল শৈলীর স্থপত্যধারা চোখে পড়ে। জমকালো জাজিমের উপর নবাব বসে আয়েসি ভঙ্গিতে হুকো টানছেন। পেছনে দুই ভৃত্য চামর দোলাচ্ছেন। পাশে বসে আছেন ভাতুস্পুত্র নওয়াজিস মুহাম্মদ খান সামনে বসে আছেন অপর ভাতুস্পুত্র সৈয়দ আহমদ খান ও দৌহিত্র সিরাজউদদৌলা। প্রতিটির প্রতিকৃতির আলাদা প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়। স্থাপত্যের কারুকাজ অত্যান্ত সুন্দর (দ্র.চিত্র-৩৪)।

ছবিতে মুঘল ছাপ থাকলেও তা মুরশিদাবাদ শৈলীর প্রকাশ পায়। ১৭৫৬ সালে আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দিলা নবাব হলে মুরশিদাবাদ চিত্রের জৌলুষ বেড়ে যায়। সিরাজউদ্দৌলা সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা পছন্দ করতেন। সেই সময় রাগামালা চিত্রের খবর পাওয়া যায় যা রাজস্থানী চিত্র দ্বারা প্রভাবিত। শোনা যায় আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর কিছু রাজস্থানী শিল্পী মুরশিদাবাদ দরবারে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এই রাগমালা চিত্রকলাতে উচ্চমার্গীয়তা প্রকাশ পায় যা দরবারি চিত্রকলাকেই নির্দেশ করে। মুরশিদাবাদ চিত্রে শুধু দরবারি চিত্রেরই স্বরূপ উদঘাটিত হয়নি তৎকালীন সমাজ চিত্রেরও ছবির প্রকাশ পাওয়া যায়। হিন্দোল, কুক্কুভ, ছিলাবল, রাগ রাগিনীতে দেখা যায় জ্যামিতিক রেখাংকনের মাঝেও প্রকৃতি ও পরিবেশের মনোরম বিন্যাস এসব ছবিতে কোন কোনটিতে নায়কের ভুমিকায় স্বয়ং নবাব সিরাজকে উপস্থিত হতে দেখা যায়। সিরাজের পর মিরজাফর যার চক্রান্তে ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতন হয়েছিল তাঁর সময়ও মুরশিদাবাদ শৈলী অব্যাহত থাকে। এই সময় অনেকটাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার শাসন ভার চলে যায়। বাংলার নবাবরা তখন ক্রীড়নক মাত্র। সেই সময় লখনউ থেকে কিছু শিল্পী এসে ছবি এঁকেছিল বলে প্রমান পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার শাসনের রাজনৈতিক পট দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। মীর কাশেমের পর ইংরেজরা মির জাফরকে নবাব করলে

চিত্র -৩৪, সপার্ষদ নবাব আলিবর্দি খাঁ,আ.১৭৫০-৫৫ খ্রি.সংগ্রহ-ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম,সূত্র:*বাংলার চিত্রকলা*

অলিখিতভাবে ইংরেজরাই অনেকটা শাসনভার নিয়ে নেয় মিরজাফর শুধু থাকেন পুতুল রাজা মাত্র। আরেকদিকে মুরশিদাবাদে হিন্দু রাজকর্মচারী ও জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং সেই সময় হিন্দু ধর্মীয় পৌরাণিক ছবির উদ্ভব ঘটে।মুরশিদাবাদ শহরের উপকণ্ঠে নিশিপুর নামক জায়গায় এই ধরনের ছবির চর্চা অব্যাহত থাকে।রামায়ণ,চৈতন্যলীলা সংক্রান্ত ছবিগুলিতে লোকজ ধারার মিশ্রণ দেখা যায়।ঐ দিকে দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর ইংরেজদের দ্বারা বন্দি ও রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। ভারতবর্ষে তখন নতুন একটি অধ্যায় শুরু হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা হল মন্বন্তর যার ফলে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলে চিত্রের চর্চা বিনিষ্ট হয়, এবং শিল্পীরা জিবীকার তাগিদে নতুন পৃষ্ঠপোষক ইংরেজদের আশ্রয়লাভ প্রার্থনা করেন। ইংরেজদের আশ্রয়ে স্থানীয় চিত্রকলা ও ব্রিটিশ (ইউরোপীয়) চিত্রকলার সংমিশ্রণে যে চিত্রকলা তৈরী হয়েছিল ঐতিহাসিকরা তাকেই কোম্পানী শৈলী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

তথ্যসূত্রঃ

১। মণীন্দ্রভূষন গুপ্ত, ***শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত***,কলকাতা:আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, , ২০১১পৃ ১০৭

২। মণীন্দ্রভূষন গুপ্ত,প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭

৩। অশোক মিত্র,***ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খন্ড)***,কলকাতা;আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,২০১২,প্.১২৫

৪। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত , প্রাগুক্ত পৃ ১০৯

৬। Stuart Cary Welch, ***Imperial Mughal Painting***, London;Chatto & Windus,1978 p 117

চতুর্থ অধ্যায়

৪.বাংলায় কোম্পানি আমলের মুঘল চিত্রকলা ও ইউরোপীয় চিত্রকলার অভিঘাত

কোম্পানি আমলের চিত্রকলার সূত্রপাত হয় সাধারণত মুরশিদাবাদকে কেন্দ্র করে। আস্টাদশ শতকেই মুরশিদাবাদে নবাবদের ক্ষমতা লোপ পায় এবং সেই জায়গায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মুরশিদবাদের কাশিম বাজারে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করা হয়। তৎকালিন সময়ে ভারতবর্ষে দলে দলে ইংরেজদের আগমন ঘটতে থাকে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় নবাবদের আশ্রয়ে যেসব শিল্পী কাজ করত তারা পৃষ্টপোষকতা হারিয়ে নতুন পৃষ্ঠপোষক ইংরেজদের কাছে দ্বারস্থ হন। মুরশিদাবাদ শৈলীর যার মধ্যে মুঘল ঘরানা বিদ্যামান ছিল সেই শৈলীর সাথে ইংরেজদের ভিক্টোরিয়ান শৈলীর এক মিশ্রণ ঘটে। অস্টাদশ শতকের মুরশিদাবাদ শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায় ইউরোপীয় স্টাইলের মিশ্রন । এখানে দেখা যায়, শিল্পীরা তাদের নিজস্ব পূর্বের রীতি ঘন জলরং বা অস্বচ্ছ জলরং (gouache) ছেড়ে ইউরোপীয় স্বচ্ছ জলরং (tint watercolour) এর দিকে ঝুকতে । ফলে একটি মিশ্র রীতির ভাব এখানে পাওয়া যায়। পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) ব্যাবহার বাড়তে থাকে এবং ছবিতে ইতালির রেঁনেসার আলোছায়া অর্থাৎ চিয়েরোস্কুরো (chiaroscuro) দেখতে পাওয়া যায়।

সেই সময় ছবির বিষয় বস্তু হিসাবে দেখা যায় নাপিত, ধোপা, মুচি, দরজি, বাবুর্চি, মিস্ত্রি ইত্যাদি নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষজনদের । পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে মুরশিদাবাদে নসিপুরে নব্য সামন্ত শ্রেণীর দ্বারা আশ্রিত মোটা তুলির আচড়ের কাজ দেখতে পাওয়া যায় এবং ছবিতে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন আসে সাধারণ লেকজনের উপস্থিতি ঘটতে থাকে। সেই সময়কার একটি ছবির কথা উল্লেখ করতে হয় আনুমানিক ১৭৮৫-৯০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা ধোপা ছবিতে দেখা যায়, দুজন ধোপি একজন কাপড় কাচ্ছে অরেকজন রোদে শুকাতে দিচ্ছে। এ ছবিতে পরিপ্রেক্ষিতে ও আলোছায়ার ব্যবহার স্পস্ট। যদিও আলোছায়ার ব্যবহারে ইউরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মত বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার দেখা যায় না।

এখানে একটি ছবির উদাহরণ টানা যেতে পারে যাতে সেই সময়কার দেশীয় শিল্পীদের উপর ইউরোপীয় অভিঘাতের মেজাজটি স্পস্ট হয়ে উঠে।উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাটনা কলমের **‘একজন বেগমের প্রতিকৃতি’** ছবিটিতে দেখা যায় ভারি গয়না পরিহিত মাথায় উড়নি দ্বারা আচ্ছাদিত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে

।এ ছবির বিশেষত্ব হল মাধ্যম এবং করণকৌশল।জমিনের রংএর উপর উচ্চকিত রং দিয়ে ছবির ত্রিমাত্রিকতা আনা যা ইউরেপীয় ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় সেই করণকৌশলটি প্রতিফলিত হয়েছে এ ছবিতে।বোর্ড পেপারের উপর পেন্সিল এবং সাদা কন্টি পেন্সিলে অংকিত হয়েছে এ ছবি।সাধারণত এ ধরনের পদ্ধতিতে ছবি আঁকা পূর্বে অভিবক্ত বাংলায়(ভারতে) খুব একটা চোখে পড়ে না।এ ছবি দেখে বোঝা যায় তৎকালীন মিনিয়েচার শিল্পীরা ভাল ভাবেই ইউরোপীয় পদ্ধতি রপ্ত করতে পেরেছিল (দ্র.চিত্র-৩৫)।

মুরশিদাবাদের কলমে মিনিয়েচার ছবির চর্চা তখনও অব্যাহত ছিল। যেমন হাতির দাঁতের উপর অসংখ্য কাজ দেখতে পাওয়া যায়।তেমনি একটি ছবি হচ্ছে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে হাতির দাঁতের উপর অংকিত ছবি **'রাধা'**, ৭.১ সেমি. x ৫.৩ সেমি.যাতে রাজস্থানী শৈলী বিদ্যমান।ছবিটি প্রফাইলে (একপাশ থেকে) অংকিত ।প্রতিকৃতির এ প্রফাইল শৈলিটি একান্ত রাজস্থানি যা মুঘল ছবিতে চর্চিত হতে দেখা যায় ।মুঘল প্রতিকৃতি ছিল সাধারণত ত্রি-কেয়ার্টার।ছবিতে রাধার মুখের প্রকাশভঙ্গি ,গয়না, উড়নির কারুকাজ মুঘল ক্ল্যাসিকাল যুগের কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয় (দ্র.চিত্র-৩৬)।যদিও পরবতির্তে আমরা কোম্পানির অগ্রাসনে মিনিয়েচার থেকে শিল্পীদের সরে আসতে দেখি। এছাড়া তখন অভ্রের পাতের উপর অংকিত ছবি দেখা যায়। মুরশিদাবাদের শিল্পীরা অভ্রের পাতের উপড় কাজ করতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে মুরশিদাবাদে প্রায় শতশত শিল্পী নিয়োগ হত মহররম ও খোজা খিজির উপলক্ষ্যে অভ্রের পাত দিয়ে তৈরী আলো চিত্রিত করার জন্য। এসব মিনিয়েচার বেশির ভাগ ছিল প্রতিকৃতি নির্ভর। প্রতিকৃতি ছাড়াও দেখা যায় নানা যানবাহনের দৃশ্য, শোভাযাত্রা, উৎসব ইত্যাদি। পন্ডিত মিলডেড আর্চার মনে করেন অভ্রের পাতের উপড় জলরং এর ধারনাটি এবং করণ কৌশল এই মুরশিদাবাদ থেকেই দক্ষিণের ত্রিচিনাপল্লিতে গিয়েছিল।[১] তবে অভ্রের পাতের উপরেও ব্রিটিশ ঘরানার ছাপ পড়তে দেখা যায়। ইংরেজরা মুরশিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় স্থাপন করার ফলে উনিশ শতকের গোড়া থেকে কলকাতাই হয়ে উঠে ব্যাবসা বানিজ্য শিল্প সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রস্থল।সমৃদ্ধ নগরী মুরশিদাবাদ হয়ে উঠে অতীত স্মৃতি বৈ আর কিছু নয়।

চিত্র- ৩৫, একজন বেগমের প্রতিকৃতি,পাটনা,বোর্ড কাগজের উপর পেন্সিল ও সাদা কন্টি
৮ সি.এম x ৬.৫ সি.এম, উনিশ শতকের মধ্যভাগ, সংগৃহিত: পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম
সূত্র: *পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল পেইন্টিংস গ্রন্থ ভলিউম ৩*

চিত্র-৩৬, রাধা,মুরশিদাবাদ, হাতির দাতের উপর মিনিয়েচার,৭.১সে.মি x৫.৩সে.মি
উনিশ শতকের প্রথম ভাগ, সংগৃহিত, পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম,
সূত্র: *পশ্চিমবঙ্গ আর্কিওলজিক্যাল পেইন্টিংস গ্রন্থ ভলিউম ৩*

৪.১ কোম্পানি আমলে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহিত রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে কোলকাতা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।কোলকাতা রাজধানী হওয়ার ফলে ক্রমেই সব বড় বড় দালানকোঠা উঠতে থাকে। অনেকে বলে থাকেন এই দালানকেঠাগুলো ছিল ইউরোপীয় বারোক রোকোকরই ধারার প্রতিফলন স্বরূপ। অলংকারধর্মী 'আর্ট ডেকো ' স্টাইলের চেয়ার টেবিল ফায়ারপ্লেস, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় ছবি ইত্যাদির আমদানি তখন হতে থাকে।

অনেকেই একে 'নিও ক্ল্যাসিক্যাল' রীতিও বলে থাকেন। সেই সময় ভারতপ্রেমী কিছু ইংরেজদের আগমন ঘটে ফলে তৈরী হয় এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ ইত্যাদি। তেমনি একজনের নাম করা যেতে পারে কলকাতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপ্রতি স্যার এলিজা ইমপের পত্নীর কথা। এলিজা ইমপে যিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপ্রতির স্ত্রী ছিলেন। তিনি ভারতের ঐতিহ্যবাহী পুঁথি ও চিত্র সংগ্রহে মনোযোগি হয়ে উঠেন। ভারতের এমনকি পূর্ব এশিয়ার নানা বর্ণের পশু পাখির সংগ্রহশালা গড়ে তোলে তার চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য তিনজন ভারতীয় শিল্পীকে নিয়োগ দেন। এরা হলেন শেখ জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস ও রাম দাস। এরা ছিলেন মুলত পাটনা থেকে আগত পাটনা কলমের শিল্পী এই পাটনা কলমের মধ্যে মুঘল ঘরানা বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ এদেরকে মুঘল উত্তরসূরী বলা যায়। এদের পশুপাখি চিত্র অনেকটা পূর্বযুগের মুঘল ঘরানার শিল্পী ওস্তাদ মানসুরের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ওস্তাদ মনসুরের মধ্যে মুঘল যুগে যেমন পশুপাখি চিত্রণের উৎকর্ষতা পাওয়া যায় ঠিক তেমনি ছাপ পাওয়া যায় জৈনুদ্দিন, ভবানি দাস, রাম দাসের কাজের মধ্যে ।এদের মধ্যে জৈনুদ্দিনের কাজ উল্লেখযোগ্য। অস্টাদশ শতকের দিকে আঁকা এসব পশুপাখির চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন হল **'সারস ও**

চিত্র-৩৭,শেখ জইনুদ্দিন,সারস পাখি,কাগজে গোয়াশ ,
উনিশ শতকের শেষভাগ, সংগ্রহ এসমোলিয়ান মিউজিয়াম অক্সফোর্ড,
সূত্র:*বাংলার চিত্রকলা গ্রন্থ*

টিয়া পাখির' ছবি ।আনুমানিক ১৭৮০-৮২ সালের দিকে অংকিত এ ছবিতে দেখা যায় অস্বচ্ছ জলরংএ পাখির সুক্ষ পালক ও ডাল, পাতা অংকিত হলেও এর মধ্যে আলোছায়ার ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে সচেস্ট ।আর এ আলোছায়া ফুটিয়ে তুলতে শিল্পী কখনও স্বচ্ছ অস্বচ্ছ রংএর আশ্রয় নিয়েছন ।অনুরূপ সারস ছবিটিতে দেখা যায় অস্বচছ জল রং এর ব্যবহারের সাথে স্বচ্ছ জলরং এর ব্যবহারের ছোঁয়া(দ্র.চিত্র-৩৭)। ধ্যানমগ্ন সারসটিতে পালকের কাজ অত্যান্ত সুন্দর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড কাজের মধ্যে স্বচ্ছ রং এর আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ের প্রাচ্য পাশ্চাত্য কাজের মাধ্যমের টেকনিকগত পরিবর্তনের রূপটি লক্ষ্য করার মত। পশ্চাত্য জলরং এর স্বচ্ছ ওয়াশের যে ব্যবহার তা ভারতীয় শিল্পীদের রপ্ত করতে দেখা যায়।শুধু জলরং নয় ছবির কাঠামোগত দিকও বদলাতে থাকে মিনিয়েচার থেকে তখন ভারতীয় শিল্পীরা সরে আসতে থাকেন।ছবির সারফেস বা জমিন বড় হতে থাকে । দেশীয় রংএর জায়গায় স্থান পায় বিলিতি রং এবং রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ান যুগের ছাই রং এর ব্যাবহারের তুলনায় উজ্জ্বল রংএর ব্যাবহার দেখতে পাওয়া যায়। ইমপে ছাড়াও অনেক ইংরেজ ভারতীয় শিল্পীদের পশুপাখি উদ্ভিদ অংকনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন বলে শোনা যায় সেই সময়। তবে মুরশিদাবাদ ও পাটনা কলমের শিল্পীদের মধ্যে প্রতিচিত্রণের ও কারিগরির যে দক্ষতা ছিল তা সর্বজন স্বীকৃত। পশুপাখি ছাড়াও চিকিৎসা শাস্ত্রের ছবিও কিছু ভারতীয় শিল্পী করেছিলো বলে শোনা যায় ১৮০৮ সালে দিকে। 'ইনস্টিটিউট অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বারাকপুরে যখন কতিপয় ইরেজদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও পশুপাখির আঁকার কাজে ভারতীয় শিল্পীরা নিযুক্ত হন। সেই সময় ভারতীয় সাধারণ মানুষজন ও তাদের জীবন যাত্রার উপর ভিত্তি করে নানান ছবির সেট তৈরী হতে থাকে। সেইরকমই কিছু ছবির সেট ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী লন্ডনে সংগৃহীত আছে।তবে ঐতিহাসিকদের মতে এগুলো তৎকালীন সময়কার দলিল বা নথি হিসেবেই অবিহিত।তবে ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে শেষ স্বার্থক শিল্পী শেখ মোহম্মদ আমির ও ই.সি.দাশ ।তবে আমির ইউরোপীয় ধারা রপ্ত করলেও ভারতীয় ছবির ধারাও তাঁর কাজে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে পশুর চিত্র অংকনে ঘোড়া ও কুকুরের কাজের উৎকর্ষতা দেখলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যেও মেলবন্ধনের কথাই মনে পড়ে।

৪.২ বাংলার প্রাদেশিক চিত্রকলায় ইউরোপীয় চিত্রকলার অভিঘাত

উনিশ শতকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরের ফলে রাতারাতি কলকাতার রূপ বদলাতে থাকে। দালানকোঠা তৈরীতে যেমন ইউরোপীয় রীতি পরিলক্ষিত হয় তেমনি সমাজজীবনের রিতীনিতীর চিত্রও বদলাতে থাকে ইউরোপীয় কায়দায় বেশভূষা,আদব-কায়দা, চুলের ছাট মানুষদের চর্চার বিষয় হয়ে উঠে।খেলাধুলা হিসাবে দশ অবতার তাসের জায়গায় স্থান পায় সাহেব বিবি গোলামের টেক্কা। সেইরূপ চিত্রকলাতেও তার প্রভাব দেখা দেয়। স্থানীয় চিত্রকররা ইউরোপীয় কায়দায় যে চিত্র অংকন করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠে তার স্বার্থক রূপ দেখতে পাই কয়রার শিল্পী শেখ মোহাম্মদ আমিরের চিত্রকর্মে। পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে শেখ মোহাম্মদ আমির ইউরোপীয় ধারায় কলকাতার যে জীবনচিত্র তুলে ধরেন তা যে কোন ইউরোপীয় শিল্পীর সমকক্ষ বলা যায়। নানামুখী বিষয় আশয় এর মধ্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ঘোড়া, সহিস ইত্যাদি দেখা যায়। বাস্তবধর্মী এ ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত, আলোছায়ার ব্যবহারের মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। একটি ছবির কথা বলা যেতে পারে আমিরের **'ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি সহ সহিস'**, আনুমানিক ১৮৪০-৫০ সালে কাগজে গোয়াশ দ্বারা অংকিত যা ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে । ছবিতে দেখা যায় পুরো পট জুড়ে ঘোড়ার গাড়িসহ সহিস ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। অত্যন্ত ডিটেইলসে প্রতিটি জিনিস অংকিত। ঘোড়ার জিন, শরীরের কোমলতা, গাড়ীর খুটিনাটি যন্ত্রাংশ যা ফটোগ্রাফি বলে ভ্রম হয় । ঘোড়া ও গাড়ীর নীচে সুন্দর ছায়াপাত ঘটানো হয়েছে। দূরে ভূমি মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যা দূর থেকে দূরে দিগন্তে আকাশের সাথে মিলে গেছে। ছবিতে ঘোড়া ও গাড়ি মূল ফোকাসে থাকলেও ল্যান্ডস্কেপ (ভূ-দৃশ্য) ভাবটি বজায় থাকে (দ্র.চিত্র-৩৮)। ছবিতে একটি অভিনব জিনিস হচ্ছে এরিয়াল পার্সপেক্টিভের ব্যাবহার ।ছবিটি গুয়াশে(অস্বচ্ছ জলরং) অংকিত হলেও এতে ওয়াশের (স্বচ্ছ জলরং) ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়।গুয়াশ হলো ভারতীয় রিতী এবং ওয়াশ টেকনিক ইউরোপীয় যা ভারতীয় শিল্পীদের পটে তৎকালীন সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকাতেও তেমনি কিছুর ছবির চর্চা আমরা দেখে থাকি যেখানে জলরং ওয়াশের টেকনিকের ব্যবহার ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৯ টি সিরিজ ছবির অ্যালবামে **'মহররমের মিছিলে'** ঢাকার অৎকালীন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ছবিগুলো ২৪ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি সাইজের কাগজের উপর অংকিত। ছবিগুলোতে লাল, সবুজ, হলুদ, খয়েরি, কালো রং এর ব্যবহার দেখা যায়।

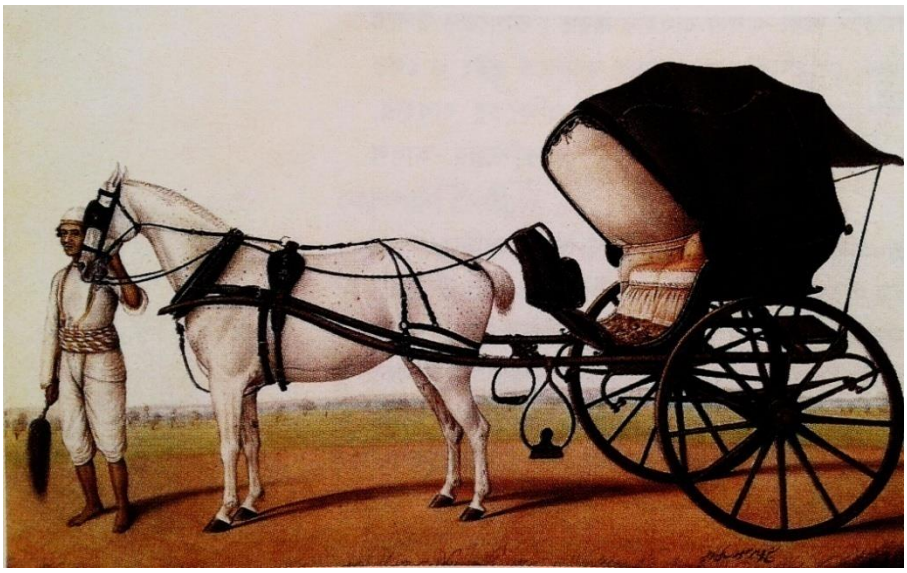

চিত্র-৩৮, শেখ মুহম্মদ আমির,ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়িসহ সহিশ, কাগজে গোয়াশ, আ. ১৮৪০-৫০খ্রি.
সংগৃহিত: ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়াম ,সূত্র:*এশিয়াটিক সোসাইটির চারু ও কারুকলা গ্রন্থ*

ছবি দেখে মনে করা হয় ছবিতে বিলেতি রং ব্যবহার করা হয়েছে। বেশ বড় পরিসরে ছবিতে বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে অংকিত ছবিতে সাপুড়ে, ভিক্ষুক কুকুর কোনো কিছুই জমিন থেকে এড়িয়ে যায় না। শিল্পী হিসাবে আলম মুসাব্বিরের নাম শনাক্ত করা গেছে। ছবির শৈলী বিশ্লেষণ করলে মুঘল ইউরোপীয় ধারার চমৎকার মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। ছবিগুলো ঢাকার নায়েব নাজিব নুসরাত জং (১৭৯৬-১৮২৩ খ্রি.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় অংকিত হয়। **'মহররমের মিছিল'** ছবিতে যেখানে বাংলার লোকায়ত দো-চালা ঘরের প্যাটার্ন দেখা যায়। পাশে দুই তলা বিশিষ্ট ইউরোপীয় ঘরানার বিল্ডিং সুক্ষ রেখার সাহায্যে অত্যন্ত ডিটেইলসে অংকিত হয়েছে খিলান, দরজা, ছাদ প্রাচীর ইত্যাদি।নিচে মহররমের তাজিয়া মিছিলে পাইক বরকন্দাজের চলার গতি যা সাধারণ মানুষ অবলোকন করছেন। উপরে কুন্ডলিকৃত মেঘ দেখা যায়। এই কুন্ডলিকৃত মেঘ মানুষ আঁকার ধরন যা মুঘল ঘরানাকে নির্দেশ করে।আবার ওয়াশের ব্যাবহার, ছবির কম্পোজিশন ওয়াইড এঙ্গেলে নিয়ে যাওয়া, ফটোগ্রাফিক ইমেজ ইত্যাদি নানা দিক ইউরোপীয় ঘরানাকে নির্দেশ করে (দ্র.চিত্র-৩৯)। ছবিকে বাস্তবিক ঘরানার দালিলিক রূপ দেয়া শুরু হয় সাধারণত ইংরেজদের আগমনের ফলে। এখানে উল্লেখ্য যে ,ইংরেজদের সাথে কিছু শিল্পী ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন পুরদস্তর শিল্পী ।সর্বপ্রথম যে শিল্পীর আগমন ঘটে তিনি হচ্ছেন টিলি কেটল (১৭৭১-৭৬)।[২] তিনি মাদ্রাজ হয়ে কোলকাতায় আসেন। এর পর

জন জেফানি (১৭৮৩-৮৯) ও আর্থার ডেবিস (১৭৮৫-৯৫) প্রমুখ শিল্পীদের নাম পাওয়া যায়। পরবর্তিতে আরো অনেক শিল্পীদের নাম পাওয়া যায় যেমন- জর্জ ফ্যারিংটন, টমাস হিকি, টমাস ও উইলিয়াম ডানিয়েল, রেনাল্ডি, জর্জ চিনেরি, চার্লস ডয়েলি, হোম ইত্যাদি।[৩] এরা যে আদর্শগত দিক ছবিতে তুলে ধরেন তা বাস্তবিক একাডেমিক রীতি যা রেঁনেসাসের ছাপ বহন করে। মূলত বাস্তবিক জিনিসের দালিলিক রূপ দেওয়াই ছিল তখনকার প্রধান কাজ। সেই সময় তিন ধরনের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- প্রতিকৃতি (portrait), ঐতিহাসিক (historical) ও মজলিশি (conventional)। এসব ছবির প্রতি বাঙ্গালী অভিজাত শ্রেণীরাও আগ্রহী হয়ে উঠেন। তবে সেই সময়

চিত্র- ৩৯,উনিশ শতকে ঢাকার কম্পানি শৈলি, মহররমের মিছিল, কাগজে জলরং, ২৪ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি
শিল্পী , আলম মুসাব্বির, সংগৃহিত-ঢাকা জাদুঘর, সূত্র :ঢাকা জাদুঘর ক্যাটালগ

মিনিয়েচার ঢংএর কাজও দেখতে পাওয়া যায়। এই মিনিয়েচারগুলো হচ্ছে হাতির দাঁতের উপর কাজ করা। হাতির দাঁতের উপর জলরংএর কাজের বিশেষ চর্চা অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে দেখতে পাওয়া যায়। বেশ কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে শিল্পীর খ্যতি অর্জনের নাম পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন জর্জ চিনেরি (১৮০২-২৫) চার্লস ডয়েলি তাঁকে তৎকালীন সময়কালের ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী আখ্যা দিয়েছিলেন। বেঙ্গল আর্মির কামান্ডার ইন চিফের পত্নী লেডি নুজেন্ট তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: ''চিনেরির ছবি দেখলাম; সাদৃশ্য ধর্মিতায় অত্যুৎকৃষ্ট ''[৪] সেই সময় দুজন মহিলা শিল্পীরও নাম পাওয়া যায় একজন শৌখিন ও অন্যজন

পেশাদার ছিলেন। শৌখিন চিত্রকর এমিলি ইডেন ডায়রিতে অনেক ছোট ছোট ছবি এঁকেছেন যা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংগৃহিত আছে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের সিস্টার ছিলেন । এছাড়াও জ্যকুইস বেলন ছিলেন এদেশে জন্মগ্রহনকারী ফরাসী শিল্পী।কলকাতার নাগরিক জীবনের চিত্র ছাড়াও অন্দর মহলের মহিলাদের আচার বেশভুষা,পূজাঅর্চনার রীতি তাঁর চিত্রপটে সুন্দর ভাবে রূপায়িত হয়েছে।ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংগৃহিত কোয়ার্টার সাইজের এসব চিত্রকর্মে দেখা যায় ওয়াশ এবং পেনের সুক্ষ আচড়ের সুন্দর কারুকাজ।

মাদাম বেলনস তাঁর চব্বিশটি ছবি নিয়ে ভিক্টোরিয়া এন্ড মেমোরিয়ার হল থেকে বের হওয়া ' টুয়েন্টি ফোর প্লেটস ইলাস্ট্রেটিভ অব হিন্দু এন্ড ইউরোপিয়ান মেনারস ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে ফুটে উঠেছে তৎকালীন সমাজ ব্যাবস্থার চালচিত্র।এসব ছবির দালিলিক মূল্যবোধ বেশ গুরুত্বপূর্ণ । তেমনি একটি ছবির নাম করতে হয় **'ক্লথ এন্ড সিল্ক মার্চেন্ট'** (দ্র.চিত্র-৪০) ছবিটিতে দেখা যায় ভারতীয় বিখ্যাত সিল্ক কাপড়ের ফেরিওয়ালা ইংরেজ অফিসারের সামনে কাপড় মেলে ধরে আকৃস্ট করতে সচেস্ট।ইংরেজ অফিসার আয়েশি ভঙ্গিতে হুকো টানারত পাশে তাঁর স্ত্রী দন্ডায়মান।সেই সময় বাংলার মসলিন খুব বিখ্যাত ছিল ইংরেজদের কাছে বিশেষ করে সেনারগাঁও ও বিক্রমপুরের মসলিন । এক একটি মসলিন বুনতে প্রায় চার মাস সময় লাগত বলে জানা যায়।এক একটি মসলিন চারশ থেকে পাঁচশত টাকা বিক্রী হত বলেও শোনা যায়।

চিত্র-৪০, মাদাম বেলনস, ক্লথ এন্ড সিল্ক মার্চেন্ট, পেন এন্ড ওয়াশ,উনিশ শতক,
সূত্র: টুয়েন্টি ফোর প্লেটস ইলাস্ট্রেটিভ অব হিন্দু এন্ড ইউরোপিয়ান মেনারস ইন বেঙ্গল গ্রন্থ

তথ্যসূত্রঃ

১ ।অশোক ভট্টাচার্য, ***বাংলার চিত্রকলা***, কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি, ২০১০, পৃ ৬৫

২ ।মাহ্মুদা খানম,***বাংলায় চিত্রকলার বিকাশ:কোম্পানি আমল,***ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ছেচল্লিশ বর্ষ,ডিসেম্বর ১০১২,পৃ১১২

৩ ।মাহ্মুদা খানম,প্রাগুক্ত,পৃ১১৩

৪ ।অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২

পঞ্চম অধ্যায়

৫.বেঙ্গল স্কুল ও প্রাচ্য চিত্রকলার চর্চা

৫.১ হ্যাভেল অবণীন্দ্রনাথ ও নিও বেঙ্গল স্কুল

মূলত, বেঙ্গল স্কুল ও প্রাচ্য চিত্রকলার চর্চা শুরু হয় অবণীন্দ্রনাথের হাত ধরেই। এই বেঙ্গল স্কুল অনেকটা স্বদেশি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল তবে অবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ভাবধারাটি উজ্জিবীত করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ । যখন বিদেশী চিত্ররীতির ভারে নিমজ্জিত ভারতীয় শিল্প তখন ঠাকুর বাড়ীতেই স্বদেশি চিত্রের চর্চার সূত্রপাত দেখা যায়। অভারতীয় ইংরেজদের মধ্যেও ভারত শিল্প প্রেমিক ছিল যাদের অবদান অনস্বিকার্য এদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় ই.বি হ্যাভেল (আর্নেষ্ট বেনিফিল্ড হ্যাভেল), সিস্টার নিবেদতা এছাড়া আনন্দ কুমারস্বামী, ওকাকুরা প্রমুখ। ই.বি. হ্যাভেল মাদ্রাজ আর্ট স্কুল থেকে ১৮৯৬ সালে কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।[১] মূলত আর্ট স্কুলগুলো ইংরেজরা তৈরী করেছিলো ড্রাফটসম্যান বা কারিগর তৈরী করার জন্য যা তাঁদের বিভিন্ন পেশায় সাহয্যকারী হিসাবে কাজ করাকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়। তবে কলকাতায় অনেক আগেই অস্টাদশ শতকের শেষের দিকে আর্ট স্কুল ও ব্যাক্তিগত প্রাইভেট আর্ট শেখানোর খবর পাওয়া যায়। ভারতের প্রথম আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে ১৮৫০ সালে সার্জন ড. আলেকজান্ডার হল্টারের ব্যাক্তিগত নিজ উদ্যোগে। এরপর কলকাতায় ১৮৫৪ সালে 'দ্য স্কুল অব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল আর্ট' নামে শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হয়। এরপর বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) ১৮৫৬ সালে মোটামুটি এই তিনটিই সর্বভারতে প্রথম আর্ট শেখার স্কুল ।'দ্য স্কুল অব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল আর্ট' পরবর্তিতে ১৯৫১ সালে ' দ্য গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট এন্ড ক্রাফট' নামে খ্যাতি লাভ করে।এসব প্রতিষ্ঠানে ব্রিটিশ শিল্পী জেশুয়া রেনল্ডস কৃত রয়েল আর্ট একাডেমির রীতিই অনুসরণ করা হত বেশি। 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন এইচ.এইচ. লক (হেনরি হোভার লক) এবং তাঁর সময় যেসব শিল্পী বেরিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অন্নদা প্রসাদ বাগচি ও শ্যামাপ্রসাদ শ্রীমানী। লকের পর এম. শুয়েমবার্গ অধ্যক্ষ হন এবং সহকারী অধ্যক্ষ হন গিলার্ডি। এই গিলার্ডির কাছেই অবণীন্দ্রনাথ পশ্চাত্য রীতির ছবি আঁকা শেখেন। পরবর্তিতে উইলিয়াম হেনরি জবিনস্ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। এই জবিন্স এর সময় যেসব শিল্পীর নাম পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শশি কুমার হেশ। তিনি পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ থেকে মুক্তাগাছা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ে ইংল্যান্ড যান এবং

চিত্রকলায় খ্যাতি অর্জন করেন। তবে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে ই. বি. হ্যাভেলের। তিনি মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে থাকার সময় ভারতীয় চারুকলা ও হস্তশিল্প সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ বেড়ে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। তিনি ১৮৯৬ সালের জুলাই মাসে আর্ট স্কুলে যোগ দেন। ই.বি. হ্যাভেল ইংরেজদের অন্তসারশূন্য নিরস অনুকরণ নির্ভর ছবি থেকে সরে গিয়ে ভারতীয় ধ্যানে মোড়া আদর্শিক ছবির দিকে ঝোঁকেন। তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে নিকৃস্ট ইউরোপীয় চিত্র ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলেন সেইখানে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ছবির স্থান

দেন। তৎকালীন সময় এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলেও রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর যে সমর্থন পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে তা স্পষ্ট :

''সেদিন এখানকার কোনো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করিতেছিলেন যে, গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের গ্যালারি হইতে বিলাতি ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভাল হইয়াছে ? আমি তাহাকে উত্তর করিয়াছিলাম যে ভালই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে বিলাতি চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা চলেনা। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায় !.. আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়াছি কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কী জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাই তা তবে যথার্থ একটা শক্তি লাভ করিবার সুবিধা হইত। ''[২]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্রকলা ও ঐতিহ্যের প্রতি সমর্থন ছিল এবং হ্যাভেল আসার আগেই অবনীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজ শুরু করেন যা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের পরামর্শেই। এই 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজে রাজস্থানী লোকজ ধারা বিদ্যমান ছিল তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। হ্যাভেল ঠাকুরবাড়ীর এই শিল্পীকে ভারতীয় শিল্প শিক্ষক হিসাবে উপযুক্ত মনে করে সহকারী অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ দেন। তাঁকে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে হেভেল সাহেবের যুক্তিটা ছিল এইরকম : ''ভাল ঘরের ছেলেরা যদি আর্টের দিকে ঝোঁকে, পাবলিকের নজর পড়বে এ দিকে। দেশের লোক তেমাদের কথায় বেশি আস্থা রাখবে।''[৩] যথার্থই গুরু শিষ্য মিলে ভারতীয় চিত্রকলা ও ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করতে ব্রতী হন।অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরেই সৃষ্টি হয় 'বোঙ্গল স্কুল' বা 'নব্যবাঙ্গীয় শৈলী' নামক ভারতের প্রথম নিজস্ব আধুনিক শিল্পধারা।তৎকালীন সময় বেঙ্গল স্কুলকে বিরোধিতা করে রণদাচরণ গুপ্তের নেতৃত্বে 'জুবিলি আর্ট একাডেমি' নামে ইউরোপীয় ঘরানার শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।[৪] এখানে অতুল বসু, হেমেন

মজুমদার, প্রহ্লাদ কর্মকার প্রমুখ শিল্পীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা পরবর্তীতে পোর্ট্রেট ও ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী হিসাবে নাম করেন। তবে 'নব্যবঙ্গীয়' ধারাটি অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই 'নব্যবাঙ্গীয়' ধারাটি ঠাকুরবাড়ীর শিল্পীদের দ্বারাই ভিত্তি লাভ করে। তবে অবণীন্দ্রনাথের আগে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে যেসব শিল্পীর খবর পাই যেমন শ্যমাপ্রসাদ শ্রিমানী,অন্নদা প্রসাদ বাগচি,শশি কুমার হেশ,বামাপদ ব্যানার্জী,কেরালার শিল্পী রাজা রবি বর্মা ভারতের শিল্পকলার জগতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন । কিন্তু এখানে জোড় দিয়ে বলা যায় যে, তাঁদের চিত্রকলা দেশীয় ঐতিহ্যআশ্রিত ছিল না।কেরালার শিল্পী রাজা রবি বর্মার (১৮৪৮-১৯০৬ খ্রি.) ছবি ভারতবর্ষে বেশ জনপ্রিয় ছিল কিন্তু তাতে দেখা যায় পুরাণ আশ্রিত ভারতীয় পাত্রপাত্রীদের ব্রিটিশ(ইউরোপীয়) আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে (দ্র.চিত্র-৪১) ।রবি বর্মা অংকিত **'হিয়ার কামস পাপা'**(Here Comes Papa) ছবিটি উৎকৃষ্ঠ উদাহরণ বলা যেতে পারে। ছবির কুশিলব ভারতীয় হলেও এর আলোছায়া(chariscuro),ড্রাপারির ব্যাবহার একেবারে ইউরোপীয় ঘরানার। ছবিটি ক্যানভাসের উপর তৈল রংএ (oil painting) অংকিত যাতে বেঝা যায় তৎকালীন সময় এদেশে ব্রিটিশদের হাত দিয়েই এ মাধ্যমটির প্রচলন হয়। একমাত্র অবণীন্দ্রনাথের চিত্রকলাতেই ভারতের পূর্বের ঐতিহ্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ভারতের মাটিতে নব্যবাঙ্গীর ধারাটিই ভারতের আধুনিক শিল্পের শিকর বলা যেতে পারে এই শিকর থেকেই পরবর্তিতে ভারতীয় শিল্পের শাখা প্রশাখা বিস্তৃতি লাভ করে যা হলপ করে বলা যায়।

চিত্র-৪১, রাজা রবি বর্মা,হিয়ার কামস পাপা,উনিশ শতক, ক্যানভাসে তেল রং

সূত্র- বিংশ শতকের ভারতের চিত্রকলা গ্রন্থ

৫.২ ভারতে প্রাচ্য চিত্রকলার চর্চা

''আমার আশা ও বিশ্বাস যে, বর্তমান উপলক্ষ্য হইতে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাবৃন্দ ক্রমশ: দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর স্নেহের বন্ধনে পরস্পর মিলিত হইতে পারিব এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদস্থ ব্যাক্তি হইতে নিম্নতম স্তরের লোকেরা সকলেই প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন যে আমার শাসন তন্ত্রে তাঁহাদের সকলের জন্য স্বাধীনতা,সাম্য ও ন্যায় বিচারের মৌলিক নীতিগুলি সম্যক রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের সুখশান্তি বিধান,তাঁহাদের সৌভাগ্য সমৃদ্ধি বর্ধন ও তাঁহাদের কল্যান সাধনই আমার সম্রাজ্য পালনের চিরন্তন উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। ''[৫]

উপরে উল্লেখিত ১৮৭৭সালে ১লা জানুয়ারীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী রানী ভিক্টোরিয়ার প্রদত্ত ভাষণ থেকে প্রতিয়মাণ হয় যে ভারতবর্ষ ছিল পুরোপুরি ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অধীন।উনিশ শতকের ভারতীয় ব্রিটিশ চিত্রকলায় বেশিরভাগ দেখা যায় প্রতিকৃতি এবং ভূদৃশের ছবি।বিশাল সাইজের টিলি কেটলের অংকিত প্রতিকৃতির (portrait) ছবি ভিক্টোরিয়া মেমোরিযাল হল এ দেখা দেখা যায় যা 'বারোক', 'রোকোকো' স্টাইলের কথা মনে করিয়ে দেয়।আবার থমাস দানিয়েল ও উইলিয়াম দানিয়েলের ভূদৃশ্যের কাজে ব্রিটিশ রেমান্টিসিজম (romanticism) শিল্পী কনস্টেবল ও টার্নারের কাজের প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায় যা ছিল বৈজ্ঞানিক বাস্তবদৃস্টিজ্ঞানসম্পন্ন।তেমনি একটি ছবি হচ্ছে **'এ ভিউ অফ কলকাতা ফ্রম হুগলি'** যা কলকাতার হুগলি (গঙ্গা) নদীকে নিয়ে তাতে অস্টাদশ শতকের রোমান্টিসিজমের ধারারই ছাপ পাওয়া যায়।ছবিতে দেখা যায় গঙ্গার বুকে সারি সারি মহাজনি নৌকা ও জাহাজ যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নির্দেশ করে। দূরে নদীর দুই পাশে নব্য কলকাতার আধুনিক বিল্ডিং।পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গার বুকে ব্রিটিশদের আয়েশি মাছ ধরার দৃশ্য। ছবির সারফেসটি ৩ঃ১ ভাগ করা অর্থাৎ আকাশের অংশ বেশি রেখে ভূমির ভাগ কম রেখে ছবি রচনা করা হয়েছে(দ্র.চিত্র-৪২)।সাধারণত ভূদৃশ্য (landscape) আমরা দেখে থাকি জমিনের অর্ধেক আকাশ আর অর্ধেক মাটি মোটামুটি এই রকমের।ছবিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে সংগৃহিত।এ ছবি থেকে স্পস্ট প্রতিয়মাণ হয় যে, ভারতে ব্রিটিশদের আধিপত্যের রূপটি কতটা প্রকট ছিল।তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিকতার বেড়াজালে যখন দেশীয় কৃষ্টি কালচার নিমজ্জিত তখনই স্বদেশিকতার উন্মাদনায় প্রাচ্য চিত্রকলার চর্চা শুরু। অবনীন্দ্রনাথকেই এই প্রাচ্য চিত্রকলার পথিকৃত বলা যেতে পারে।তবে এই প্রাচ্য চিত্রকলার মডেল হিসাবে অজন্তাা এবং মুঘল চিত্রকলাকেই হ্যাভেল এবং

অবণীন্দ্রনাথ শ্রেয় বলে মনে করেন । পরবর্তীতে কালীঘাটের পট এবং নানান লোকজ বিষয় আশয় আশ্রিত করে শিল্পীরা কাজ করেন। তবে দেশীয় নিজস্ব রীতির উন্মেষ ঘটান অবণীন্দ্রনাথ ও তার অনুসারীরা যা ছিল সময় উপযোগী। কারণ অনেক ইংরেজ ভারতীয় শিল্পকলাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন।তার প্রমাণ পাওয়া যায় সামালোচক বার্ডউড এর মন্তব্যে তিনি বলেন: ''চিত্র ও ভাস্কর্যে লালিত শিল্প বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ভারতবর্ষে নেই।''[৬] এই উক্তিটির ভুল প্রমাণিত করেন যখন হ্যাভেলের মত পন্ডিত ব্যাক্তি মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে থাকাকালীন সময় সরকারি প্রকল্পে ভারতীয় কারুকলা ও হস্তশিল্প সম্পর্কে গবেষণা করে ভারতীয় শিল্পের গভীরতা অনুভব করেন এবং এর জাগরনের ভার অবণীন্দ্রনাথকে অর্পন করেন। তবে অবণীন্দ্রনাথ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষ পদে ১৯০৫ সালে যেগদানের আগেই গিলার্ডির কাছে ইউরেপীয় চিত্রকলা (drawing) এবং চার্লস পামারের কাছে ইউরোপীয় তৈলচিত্র (oil painting)পদ্ধতি আয়ত্ত করেন বলে শোনা যায়। ইউরোপীয় চিত্র পদ্ধতির উপর দখল থাকলেও তা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই তাঁকে পট পটুয়া আশ্রিত ছবির মধ্যে ঢুবে

চিত্র:৪২, ,থমাস দানিয়েল,'এ ভিউ অফ কলকাতা ফ্রম হুগলি',ক্যানভাসের উপর তৈলচিত্র, ১৭৮৫ খ্রি.
সংগৃহিত-ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল,কলকাতা,সূত্র:*পিকচারেস্ক গঙ্গা পেইন্টিংস* বুক

যেতে দেখি । তাঁর নিজের কথাতে দেখা যায় : ''পুতুলের গায়ের 'টাচ্' বড়ো চমৎকার।পটও তাই, এই জন্যই আমার পট ভালো লাগে, বড়ো পাকা হাতের লাইন সব তাতে।''[৭] উক্তিটিতে বোঝা যায় দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল কতটা গভীর। সেই মোতাবেক বৈষ্ণব আশ্রিত লোকজ কৃষ্ণলীলার মধ্যে

তাঁর মননশীলতার প্রকাশ ঘটে। এই সিরীজটি তিনি ১৮৯৫ সালে অংকন করেন। মোটামুটি বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে **'কৃষ্ণলীলা'** সিরিজটিই 'নব্যবঙ্গীয়' রীতির দেশীয় ঘরানার প্রথম আধুনিক প্রকাশ।রাজস্থানী শৈলীকে তিনি পুরোপুরি নিজস্ব ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন । তুলি চালনায় বলিষ্টতা পাওয়া যায় যা রাজস্থানী বা অন্যান্য পাহাড়ী চিত্রে পাওয়া যায় না। মাধ্যম হিসাবে তিনি ভারতীয় চিরায়ত জলরংএর গেয়াশ পদ্ধতি (gouache) ব্যবহার করেছেন (দ্র.চিত্র-৪৩) ।এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের মিল খুজে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর তৈল চিত্র অপেক্ষা জলরং চিত্রকেই অধিক পছন্দ করতেন।

তৎকালীন সময় নব্যবঙ্গীয় রীতিকে উপেক্ষা করে' জুবিলি আর্ট একাডেমি' নামে শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে রনদাচরণ গুপ্তের নেতৃত্বে তা পূর্বেই বলা হয়েছে।এই 'জুবিলী আর্ট একাডেমি' অখন্ড ভারতে একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।অতুল বসু, হেমেন মজুমদার, প্রহ্লাদ কর্মকার প্রমুখ শিল্পীদের চিত্র শিক্ষা গ্রহন করতে দেখা যায় অনেকটা 'নব্যবঙ্গীয়' রীতিকে উপেক্ষা করে। তাঁদের চিত্রকলা ছিলো কেরালার শিল্পী রাজা রবি বার্মার মতো ব্রিটিশ স্টাইলে ভারতীয় পাত্র পাত্রীদের উপস্থাপন । ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য বিশেষ করে অজন্তা, মুঘল, পাল,পাহাড়ী পুঁথিচিত্র ইত্যাদি শৈলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় একমাত্র নব্যবঙ্গীয় ঘরানাতেই।

চিত্র-৪৩ , অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণলীলা চিত্রমালা (প্রেমের আহ্বান),১৮৯৫-৯৭খ্রি.জলরং(গোয়াশ)

সূত্র :বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা: আধুনিকতার বিবর্তন

এখানে উল্লেখ্য যে, জোড়াসাঁকোতে আমন্ত্রিত পন্ডিত শিল্পী ওকাকুরার স্লোগান ছিলো : 'এশিয়া ইজ ওয়ান' অর্থাৎ 'এশিয়া এক'[৮]এটিও বেশ প্রভাবিত করে এবং দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় ওকাকুরা জাপানে গিয়ে তিনজন শিল্পী পাঠান টাইকান, জোশিয়ো কাৎসুতা ও হিসিদা সুনসো প্রমুখ এঁদের মাধ্যমে প্রাচ্য শিল্পের অর্থাৎ জাপানি ঐতিহ্যবাহি চিত্রকলা ও ভারতীয় চিত্রকলার মেলবন্ধন তৈরী হয়। বিশেষ করে শিল্পী টাইকান ও হিসিদার কাছে অবন ঠাকুর ও অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ শিখেন জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি,রেখাচিত্র ইত্যাদি।অবণীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় পদ্ধতি, ভারতীয় মুঘল শৈলী এবং জাপানি ওয়াশ পদ্ধতির সমন্বয় এক অভিনব নিজস্ব 'ধৌত পদ্ধতি'(wash technicq) রীতি চালু করেন যা 'নব্য বঙ্গীয়' বা 'প্রাচ্য রীতি'র শৈলী হিসাবে বিশেষ পরিচিতি পায়। ১৯০৫ সালের আগেই তাঁর এই নব নির্মিত পদ্ধতি বেশ বিখ্যাত হয় উঠে বিশেষ করে ১৯০৫ সালে অংকিত আইকোনগ্রাফিক **'ভারতমাতা'** ছবিতে (দ্র.চিত্র-৪৪)।এ ছবিতে ওয়াশ পদ্ধতির স্বার্থক রূপ দেখা যায় ।এই বিশেষ এক ছবি আঁকার পদ্ধতি যা প্রাচ্য কলার স্টাইল হিসাবে খ্যাত যা বলা যায় অবণীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার ।এই ওয়াশ পদ্ধতি হচ্ছে ছবির জমিন ভিজে থাকতে রং লাগিয়ে শুকিয়ে আবার ভিজিয়ে রং লাগাতে হয় এভাবে স্তরে স্তরে রং লাগিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এ সম্পর্কে অবণীন্দ্রনাথের উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য :

''ওকাকুরার ছাত্ররা-টাইক্কান,হিশিদা এদেশের আর্ট স্টাডি করতে তাঁরা যখন ছবি আঁকতেন, তুলিতে জল নিয়ে কাগজ অল্প অল্প ভিজিয়ে নিতেন।অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন।একদিন নিজের আঁকা পুরো ছবিটাই জলে ডুবিয়ে দিলেন। সবাই ভাবলেন,গেল ছবিটা নষ্ট হয়ে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন,ছবিটা জল থেকে তুলে দেখি ছবি নষ্ঠ তো হয়ই নি, বরং রংএর'হার্ডনেস'টা চলে গেছে ।বেশ একটা সফট্ এফেক্ট এসেছে।'' [৯]

সেই থেকে অবণীন্দ্রনাথ নিজস্ব ওয়াশ পদ্ধতি চালু করলেন যা প্রাচ্য কলা শৈলী হিসাবে পরবর্তিতে চর্চিত হয়।তবে প্রাচ্য কলা বা নব্যবাঙ্গীয় ধারাটি জনপ্রিয় করতে ই.বি হ্যাভেল যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯০২ সালে ১ বৎসরের ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে 'দি স্টুডিও' পত্রিকায় চিত্রকলা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন যাতে বিষয় হিসাবে ' নব্য বঙ্গীয়' রীতি ও অবণীন্দ্রনাথের চিত্রকলার পরিচয় বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন। এতে ছবি সংযুক্ত হয় 'বুদ্ধ ও সুজতা ' এবং 'অভিসারিকা' যা তৎকালীন সময় কলা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

চিত্র-৪৪,অবণীন্দ্রনাথ, ভারতমাতা,১৯০৫ খ্রি. জলরং,
সূত্র: *বিংশশতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন*

একই সময়ে ১৯০২-৩ সালে দিল্লীর রাজকীয় প্রদর্শনীতে মুঘল স্টাইলকে আশ্রিত করে তিনটি ছবি প্রদর্শিতহয় এবং এতে 'অন্তিমশয্যায় শাহজাহান', 'তাজনির্মাণ'ইত্যদি ছবিগুলো কলারসিকদের দ্বারা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। এতে অবনীন্দ্রনাথের শৈলী ও নাম ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের দায়িত্বরত অবস্থায় যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর হাত দিয়ে শিক্ষা লাভ করে মুলত তারাই এই 'নব্য বঙ্গীয়' ঘরানাটিকে মূল ভিত্তি দেন এবং চারিদিকে প্রসারিত করেন। এই ছাত্ররা হলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায়, নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কে ভেঙ্কটপ্পা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ, দে হাকিম মোহাম্মদ খান প্রমুখ।এছাড়াও লাহোর প্রবাসী আবদুর রহমান চুঘতাইএর নাম শোনা যায় যিনি অবণীন্দ্রনাথের কাছে প্রাচ্য ধারার তালিম নেন এবং শিল্পের জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

শোনা যায় অবণীন্দ্রনাথ ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন গল্প বলার ছলে নিজে কাজ দেখিয়ে দিতেন। সাধারনত পাশ্চাত্য শিক্ষা মডেল দেখে অবিকল আকঁতে হয়। এখানে অবনীন্দ্রনাথ লৌকিক, পৌরানিক, দেবদেবীর কাহিনী ও ঐতিহ্যবাহী যাদুঘর দর্শনের মাধ্যমে এবং প্রকৃতি অবলোকনের দ্বারা এক অভিনব পন্থায় ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন। ফলে প্রাচ্যকলার রোমান্টিক আধ্যতিকতায় ভাবাদর্শে মোড়া ছবির চর্চা

হতে থাকে যা অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় রোমান্টিসিজম (romanticism) থেকে পুরোপুরি আলাদা।শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন : ''এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরুমহাশয়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ো না।মনে রেখ যে পাখি পড়াতে হলে পাখির সঙ্গে নিজেও পাখি হতে হয়।''[১০] এ থেকে স্পস্ট প্রতিয়মাণ হয় যে অবনীন্দ্রনাথ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে জগদ্দল পাথর না হয়ে আনন্দ বিস্তারের মাধ্যমে শিক্ষা দানের দিকে জোর দিয়েছিলেন।নব্যবঙ্গীয় রিতীর দ্বিতীয় পর্বের শিল্পীরা হলেন সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুল চন্দ্র দে,হীরাচাঁদ দুগার,অর্ধেন্দু বন্দোপধ্যায়,রমন্দ্রেনাথ চক্রবর্তি,বিনেদবিহারী মুখোপধ্যায়,ধীরেন্দ্রকৃষ্ন দেব বর্মন, প্রমুখ। তবে 'নব্যবঙ্গীয়' বা প্রাচ্যকলার ধারা তৈরী করতে ঠাকুরবাড়ি বিশেষ করে জেড়াসাঁকের শিল্পীদের ভুমিকা অগ্রগন্য।গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,সুনয়নী দেবী,রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর,নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নাম।এই নব্যবঙ্গীয় ধারা পরবর্তীতে 'সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল 'নাম নিয়ে ভারত বর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদেশের মাটিতেও নিয়মিত প্রদর্শনী ও প্রচারের মাধ্যমে সুধি সমজের দৃস্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১।অশোক ভট্টাচার্য, ***বাংলার চিত্রকলা***, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী,২০১০ পৃ১২০

২। মৃণাল ঘোষ, ***বিংশ শতকে ভারতের চিত্রকলা; আধুনিকতার বিবর্তন,*** কলকাতা: প্রতিক্ষন, ২০০৫,পৃ ১১০

৩।অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাণী চন্দ,***জোড়া সাঁকোর ধারে*** ,কলকাতা:বিশ্বভারতী, ১৪১৮ পৃ ১০৩

৪।অতুল চন্দ্র বসু,***গগনেন্দ্রনাথ,*** কলকাতা:শনিবারের চিঠিশিল্প ও শিল্পী সংখ্যা,নাথ পাবলিশিং,২০০৯,পৃ ১৭

৫। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল থেকে সংগৃহিত রাণী ভিক্টোরিয়ার বাণী

৬।মৃণাল ঘোষ,প্রগুক্ত,পৃ১৫০

৭।অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রানী চন্দ,প্রাগুক্ত,পৃ ১০৩

৮।অশোক ভট্টাচার্য, ***বাংলার চিত্রকলা***,প্রাগুক্ত,পৃ১২৫

৯।শ্রীরানী চন্দ,***শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ,*** কলকাতা;বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,১৪০৬ পৃ ১১২

১০।অসিত কুমার হালদার, ***শিল্পকথা(অবনীন্দ্র-জয়ন্তী),***কলকাতা;পত্রলেখা,২০১৫ ,পৃ ১০২

ষষ্ঠ অধ্যায়

অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের চিত্রকলায় মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাবনা

গুণেন্দ্রনাথ ও সৌদামিনির কনিষ্ঠ পুত্র অবণীন্দ্রনাথের(১৮৭১-১৯৫১) নিজের কথাতেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যেমন তিনি বলেন, 'আমি মুঘল সিদ্ধ'তেমনি রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়ের 'দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা' বইতে উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি কথার ছলে নন্দলালকে বলেছিলেন ''মোঘলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের পিরালী ধারায় আছে এ কায়দা''[১] অর্থাৎ এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় অবণীন্দ্রনাথ মুঘল অনুচিত্রের মধ্যেই ভারতীয় ঐতিহ্যের বীজ দেখেছিলেন যদিও তাঁর শিক্ষা শুরু হয় ইউরোপীয় ধারার স্টাইলে। তিনি গিলার্ডির কাছে ফিগার ড্রইং, পোট্রেট,তৈলচিত্রের করণকৌশল শেখেন। চার্লস পামারের নিকট শেখেন ব্রিটিশ ধারার জলরং। এসবের সমন্বয়ের পরও তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিকড়ের দিকেই। ভারতীয় স্বদেশী ভাবনায় দিক্ষীত হয়ে তিনি বিষয় খোঁজেন পুরাণ, লোক সাহিত্য, মুঘল অনুচিত্র, মুরাক্কা ইত্যাদির মধ্যে। ই. বি হ্যাভেল গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময় ১৯০৪ সালের দিকে কলেজের পাঠ তালিকা সাজাবার জন্য ইউরোপীয় ল্যন্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট সাজিয়ে সেই যায়গায় স্থান দেন মুঘল চিত্র বিশেষ করে ওস্তাদ মনসুরের পাশু পাখির সব বিখ্যাত চিত্র। মুঘল ঘরানা ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য মুরশিদাবাদ শৈলীর শিল্পী লালা ঈশ্বরী প্রসাদকে নিযুক্ত করেন কলেজে এবং সেখানে উপাধ্যক্ষ হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ যোগ দিয়ে ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে মুঘল ঘরানা তালিম নেন বলে শোনা যায়। তবে প্রথম দিকে অবনীন্দ্রনাথকে 'কৃষ্ণলীলা' ছবির সিরিজ দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তিতে তাঁকে আমরা মুঘল ঘরানার দিকে যাত্রা করতে দেখি। অবনীন্দ্রনাথের হজম শক্তি ছিল প্রকট। সকল ধরনের শৈলীকেই আত্বস্থ করতে দেখা যায় যেমন ইউরোপীয়,মুঘল,রাজস্থানী,জাপানী ওয়াশ থেকে শুরু করে বলা যায় লোকশিল্প পর্যন্ত।রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বৈষ্ণব পুঁথির 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজের শুরু জাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে যা তিনি ধরে রেখেছেন আজীবন। বাগেশ্বরীর ২৯ টি বক্তৃতা যা তিনি ১৯২১-২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন সেখানে স্যার আশুতোষ ইংরেজিতে বক্তৃতা দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেও তা উপেক্ষা করে তিনি বাংলায় দিয়েছিলেন । এখানে তাঁর বাংলা ভাষার ও ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পায়। তবে স্বদেশি চেতনায় প্রথম আধুনিক ছবি হচ্ছে চন্ডিদাস বিদ্যাপতির

কবিতাকে উপজীব্য করে গোবিন্দ দাসের দু লাইনের কবিতাকে কেন্দ্র করে অবনীন্দ্রনাথের 'শুক্লাভিসার' যা তিনি এঁকেছিলেন বৈষ্ণব আধুনিক পদাবলি থেকে :

''পৌখালী রজনী পবন বহে মন্দ
চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্দ ''[২]

পরবর্তীতে তাঁর 'আভিসারিকা' ছবিটি এই ধারারই ফসল। সম্ভবত ১৮৯৫ সালের দিকে তিনি এই কাজ করেছিলেন। তাবে অবনীন্দ্রনাথের মুঘল মিনিয়েচারের প্রতি ঝোঁক পাওয়া যায় ঠাকুর বড়িতে হাতির দাতের উপর মিনিয়েচার শেখানো হত বলে খবর পাওয়া যায়এবং প্রথম দিকে তাঁর হাতে বোন বিনয়িনীর স্বামীর মাধ্যমে মুঘল মিনিয়েচার ও আইরিশ ইল্যুমিনেশনের ছবি পৌঁছেছিল এবং তিনি মুঘল মিনিয়েচারকেই আদর্শ হিসাবে মেনেছিলেন।এ সম্পর্কে তাঁর উক্তিটি উল্লেখযেগ্য,তিনি বলেন:

''মোগল আর্ট খানিকটা পরিমানে বেঁচে ছিল বলেই না আমাদের আর্টকে চিনে নিতে পারলুম ? এ যেন নিকট আত্মীয়কে চিনে নেওয়া গোছের" ।[৩]পরবর্তিতে হ্যাভেলের সংস্পর্শে ও গভর্নমেন্ট কলেজে যোগ দিয়ে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে মুঘল শৈলীর তালিম নেন তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মুঘল বিষয় ও মুঘল শৈলীর পরোপুরি প্রকাশ দেখা যায় ১৯০২ ও ১৯০৩ এর দিকে দিল্লীর দরবারের রাজকীয় প্রদর্শনীতে পাঠানো ছবিগুলোতে যেমন অন্তিম শয়নে শাহজাহান, তাজ নির্মান, বন্দি বাহাদুর শাহ জাফরের ছবি ইত্যাদি। তবে **'অন্তিম শয়নে শাহজাহান'** ছবিটি শুধু বিষয় দিক দিয়ে নয় এর রূপসজ্জা ও অলংকরণেও মুঘল শৈলী ধরা পড়ে। বিষয় দিক দিয়ে ছবিটির সাথে মুঘল চিত্র 'এনায়াতে খাঁ'র মৃত্যু ছবিটির মিল পাওয়া যায় ছবিটিতে নিঃশ্ব রিক্ত শাহজাহান পালংকতে শুয়ে দূরের তাজের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কার্পেট, স্তম্ভ ও প্রাচীরের কারুকাজ অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। মুঘল যুগের এরাবেস্ক ডিজাইন প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র।এরিয়াল পরিপ্রেক্ষিতের সাহয্যে দূরের তাজমহল দেখানো হয়েছে যা শাহজাহান প্রায়শই অবলোকন করতেন। পায়ের সামনে সম্রাটের মেয়ে জাহানারা বসা সব মিলিয়ে ছবিতে করুন রসের আবহ তৈরী হয়েছে (দ্র.চিত্র-৪৪) ।ছবিতে অকাল প্রয়াত অবণীন্দ্রনাথের মেয়ের মৃত্যু যন্ত্রণা ঢেলে দিয়েছিলেন। কাঠের উপর তেল রং এ অংকিত জলরং এর মতোই এর ব্যবহার করেন এতে তার নিজস্ব একটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিটি পরবর্তিতে আরেকটি কপি করেন ভারতসচিব মন্টেগুর জন্য তা ছিল জলরংএ ।ছবিটি দিল্লী দরবার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। এবং অবণীন্দ্রনাথের নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

অস্বচ্ছ জলরং এ করা ‘তাজের নির্মাণ ’ ছবিটি অবনীন্দ্রনাথ আঁকেন ১৯০১ সালে পুরোপুরি মুঘল অনুচিত্রের আদলে আঁকা হুকো হাতে শাহজাহান সভাসদ নিয়ে দূরের তাজমহল নির্মাণ অবলোকন করছেন। ছবিতে পোষাক পরিচ্ছদ, সিংহাসন, চাঁদোয়া, ছাদপ্রাচীরের কারুকাজ ও অলংকরনের মাত্রা দেখলে শাহজাহানের যুগের ছবির কথাই মনে পড়ে (দ্র.চিত্র-৪৫)।

তৎকালীন সময়ে তাঁর ছবির বাক পরিবর্তন হতে দেখা যায় এর বিশেষ কারণ জাপানি শিল্পী ওকাকুারার সাথে তাঁর পরিচয়। পন্ডিত শিল্পী ওকাকুরার স্লোগান ছিল ‘এশিয়া এক তার আত্মা এক ’[৩] সেই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথের জাপানী চিত্রের সাথে পরিচয়। ওকাকুরার নির্দেশে জোড়াসাঁকোতে আগত জাপানী শিল্পী টাইকান ও হিসিদার কাছে জাপানী ওয়াশ পদ্ধতি শিক্ষা লাভা করেন অবণীন্দ্রনাথ।তবে এই ওয়াশ পদ্ধতির প্রয়োগ ছিলো একেবারেই নিজস্ব। ভারতীয়,মুঘল বা ইসলামী চিত্রে যেমন দেখা যায় শূন্যতার কোনো স্থান নেই।জগৎ প্রাণময়। সর্বব্যাপী তুলির কাজ। চীন বা জাপানী শিল্প এর উল্টো এখানে শূন্যতাই শিল্প। এখানে পটের সাদা জমির সাথে রং এর বা বিষয়ের ভাবের সাথে পরস্পরের ভাবের সংযোগ ঘটে। অনেকটা চীনা শিল্প ষড়ঙ্গের প্রয়োগ অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ একটি ছবির উদাহরণ হচ্ছে ‘ভারতমাতা’ যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ১৯০৫ সালে জলরংএ অংকিত নিজস্ব ধৌত পদ্ধতির (wash technique) এক উৎকৃষ্ট ছবি।ছবিটিতে ভারতীয় নারীর প্রতিরূপ ফুটে উঠেছে এক মহান ভাবালুতায়। ত্যাগী দেশমাতৃকাকে শিক্ষা,দীক্ষা,অন্ন,বস্ত্রে সজ্জিত করে আইকনিক রূপ দেন। অবনীন্দ্রনাথ এ ছবিতে উপনিবেশিক ভারতে নিজস্ব আঙ্গিকে ভারতীয় চিত্রের আকুল ধারার পথটি আবিস্কার করেন।ধৌত পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

‘‘টাইকানকে ছবি আঁকা দেখে দেখেই একদিন আমার মাথায় এল,জলে কাগজ ভিজিয়ে ছবি আঁকা হয়। টাইকানকে দেখতুম ছবিতে খুব করে জলের ওয়াশ দিয়ে ভিজিয়ে নিতে। আমি আমার ছবিসুদ্ধ কাগজ দিলুম জলে ডুবিয়ে। তুলে দেখি বেশ সুন্দর একটা এফেক্ট হয়েছে। সেই থেকে ওয়াশ প্রচলিত হল।[৪]

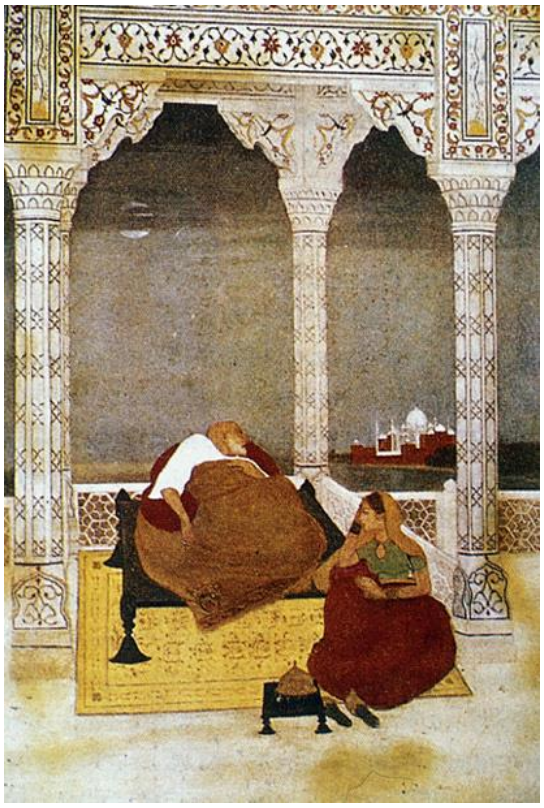

চিত্র- ৪৪,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তিম শয়নে শাহজাহান', ১৯০২ খৃ. কাঠের উপরে তেলরং, ৩৫.৫৬ x২৫.৪ সে.মি.
সংগৃহিত : রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, সূত্র:*বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন গ্রন্থ*

নব্যবঙ্গীয় ধারাটি প্রচার উপলক্ষে ১৯০৭ সালে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টোল আর্ট ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। দেশে বিদেশে আধুনিক ভারতীয় চিত্ররিতীর প্রকাশ পথটি তৈরী হয়ে যায়। তৎকালীন সময়ে ১৯১২ সালে ভারত প্রেমী ওকাকুরা কোলকাতায় আসেন এবং অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ধরে বইতে তাঁর একটি উক্তি উল্লেখ করেন যে উক্তিটি প্রনিধান যোগ্য : "দশ বছর আগে আমি এসেছিলাম তখন তোমাদের আজকলকার আর্ট বলে কিছুই দেখিনি এবার দেখি তোমাদের আর্ট হবার দিকে যাচ্ছে। আবার যদি দশ বছর বাদে আসি। তখন হয়ত দেখব হয়েছে কিছু।"[৫]

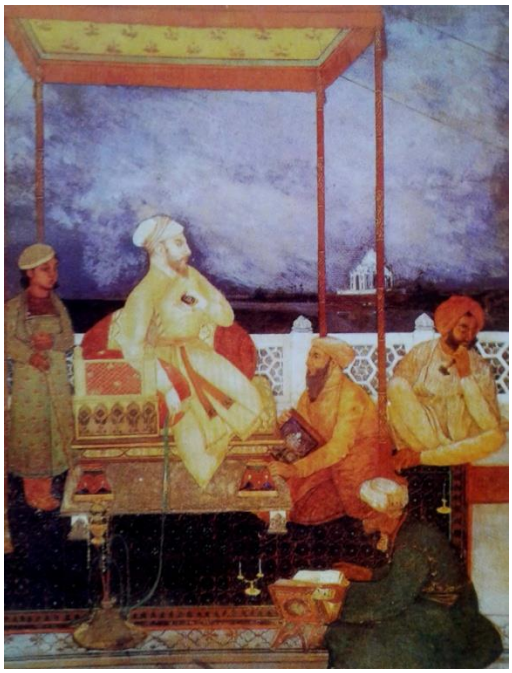

চিত্র- ৪৫,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,তাজ নির্মান,জলরং(গোয়াশ),১৯০১ খ্রি.

সূত্র:বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা: আধুনিকতার বিবর্তন

উক্তিটি থেকে বোঝা যায় তৎকালীন ভারতীয় ছবির গতি প্রকৃতি এবং এই গতির সমন্বয়ক অবন ঠাকুর তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৯০২-১৩ সালে তাঁর আঁকা **'শেষ যাত্রা'** ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মরুভূমির মধ্যে একটি উটের প্রতিকৃতি যা পারসিক ও মুঘল ধারারই পশু চিত্রণের কথা মনে করিয়ে দেয়। অতীত এ ধারাটিকে সুন্দরভাবে নিজস্ব আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন তিনি। প্রতীকি এ ছবিতে দেখা যায় উষর মরুভূমিতে একটি উট পিঠে বোঝার চাপে পা ভেঙ্গে মাটিতে বসে যাচ্ছে। পিছনে রক্তিম আকাশ যেন ঝড়ের সংকেত পরক্ষনেই বিপদের ঘনঘাটা। ছবিটি যেন তাঁর জীবনেরই প্রতিফলন উপনিবেশিক আমলে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের বোঝাটি তাঁর পিঠে ন্যাস্ত তিনি সেই ভার বইতে ক্লান্ত (দ্র.চিত্র-৪৬)। নানা প্রতীকুলতা আসন্ন এক বিষাদময় ভাব ব্যাঞ্জনা ছবিটিতে পরিলক্ষিত।এ ছবিতে বিশেষ তাৎপর্য হল এর ভাব ব্যঞ্জনা যা মুঘল যুগে অনুপস্থিত।মুঘল যুগে এক ধরনের অলংকরণ, মোটিফ ও টাইপ বারবার ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এখানে অবণীন্দ্রনাথ মুঘল যুগের সাথে নিজস্ব ভাবযুক্ত করে বিংশ শতকের এক চমৎকার মেলবন্ধন ঘটান।

তাঁর অংকিত নিসর্গের ছবিগুলোও অভিনব। সেই ছবিগুলোতে তিনি নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা ঘটান। পাশ্চাত্যের স্বচ্ছ জলরং এর সাথে জাপানী ওয়াশ পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নিজস্ব ভাবধারায় দৃশ্যগুলো উপস্থাপন করেন। এই রকম নিসর্গের এক রোমান্টিক ভাবালুতা এর আগে ভারতীয় চিত্রে দেখা যায় না। ১৯১৯-২০ সালের দার্জিলিং এর নিসর্গের ছবি দিয়ে ভারতীয় আধুনিক ভূ-দৃশ্যের (landscape) যাত্রা শুরু বলা যায়। পরবর্তিতে ১৯২৬-২৭ সালে দিকে সাজাদপুরের পল্লি বাংলার এক অপূর্ব নিসর্গ চিত্র রচনা করেন ।জমিদারী সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ সিরাজগঞ্জের সাজাদপুরের কাছারি বাড়ীতে তদারকিতে আসেন। সেই সময় তিনি যমুনার তীরবর্তী সাজাদপুরের মোহনীয় রূপে আবদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ যেমন পদ্মার বর্ণনা দেন শিলাইদহে এসে ঠিক তেমনি অবনীন্দ্রনাথের আঁকায় এবং লেখায় পূর্ব বাংলার রূপ ফুটে উঠে। তেমন একটি ছবি হচ্ছে **উল্লাপাড়া স্টেশন** (দ্র.চিত্র-৪৭) ছবিটিতে দেখা যায় সন্ধ্যার আকাশে একরাশ কালো ধোয়া ছাড়িয়ে ট্রেন ধেয়ে আসছে ।

চিত্র- ৪৬, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষ যাত্রা' , আ.১৯১৩ খ্রি. কাগজে অসচছ জলরং, ২১ x ১৫ সেমি.ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল গ্যালারি সংগ্রহ,সূত্র:*পেইন্টিংস অব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পপুলার এডিশন*

দূরে স্টেশনের কাছে ঘাটে সারি সারি নৌকা বাঁধা এক অপূর্ব ব্যাঞ্জনা ফুটে উঠেছে ছবিতে। পূর্ববঙ্গের সাহজাদপুরের দৃশ্যপট শুধু চিত্রেই নয় তাঁর লিখনিতেও চমৎকার গ্রামবাংলার রচনা বিধৃত হয়েছে। খুকিকে লেখা একটি চিঠি যা পার্থজিৎ গঙ্গোঁপধ্যায়ের অগ্রন্থিথ অবনীন্দ্রনাথ বইয়ে উল্লেখ আছে নীচে এর উদ্ধৃতি দেয়া হল:

"এবারে এখানে বান ডেকে সব জলে ভর্তি। ঘরদুয়ার গাছপালা ঘোড়া গরু সবাই হাটুজলে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকায় কিন্তু ভারী আনন্দ- যাত্রীবহে ধানক্ষেতের উপর দিয়েই পাল তুলে পাখির মত চলেছে- চমৎকার দৃশ্য। পানুবাবু আর তুই বেশ আসতে পারতিস। ভোরে বোটে চড়ে বেলা দশটার মধ্যে পৌছে গেছি। পথে মুষলধারে বৃষ্টি। চমৎকার শোভা দেখতে দেখতে চলে এলেম, এ যেন কবিতার রাজত্ব। সোনার বাংলার অপরূপ রং দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করে এইখানে একটা নৌকায় অনেক দূরে দূরে ঘুরে ফিরে খালি চলেই চলি ভেসে আর ভেসে। আজ চাঁদ উঠেছে সপ্তমীর- জলের উপর নৌকায় ছেলের দল গান গেয়ে বেড়াচ্ছে কী তাদের ফুর্তি! আমার ভাঙ্গা হাতে ছবিও হয় না বেশি লেখাও চলে না -এই মাত্র টাকার ঘরা সিন্দুকে তুলে এসে এই চিঠি লিখছি। উৎসব সাঙ্গ হলো, এবারে কিছু কাজ আর একটু একটু বিশ্রাম। আসছে হপ্তায় বাড়ি যাবো। আমি বেশ আছি। কলিমুদ্দি মিয়ার কারি কাটলেট আর গয়লাবড়ির দুধ, মুদির সন্দেশ খুব চলছে।"[৬]

অবণীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে তাঁর বাংলার প্রকৃতির উপর গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পায়। উক্ত বইয়ে উল্লেখ আছে তাঁর প্রথম দিককার ছাত্র অসিত কুমারকে তিনি বলেছেন: "বোঁটা ছাড়া ফল যেমন অসম্ভব tradition ছাড়া আর্ট ও তেমনি অসম্ভব।[৭] এই tradition কে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১৯০৭ সালে লর্ড কিচনার,কয়েকজন ইংরেজ ,বড় ভাই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তৎকালীন সুধি সমাজ মিলে তিনি তৈরী করেন 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এখান থেকে নিয়মিত প্রদর্শনী ও নব্যবঙ্গীয় এ রীতির প্রচার কাজ চালানো হয়। শুধু ছবি নয় সাহিত্য সেবাতেও তাঁর অনন্য দেশীয় ছাপ পাওয়া যায়। অংকন ও শিল্প সাহিত্য, সংগীত ও নাট্যকলা চর্চার জন্য জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে ১৯১৫ সালে 'বিচিত্রা ভবন' তৈরী করেন। এই বিচিত্রা সভাতেই ছাপানোর মেশিন বসিয়ে নানান রকম লেখালেখি,ছবির প্রচার কাজ করেন এবং সেখানে অক্ষর চিত্র নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী কাজ পাওয়া যায়। ঐতিহ্যবাহী মুঘল ঘরানার বিশেষ স্টাইলটি তিনি **'ওমর খৈয়াম'** চিত্রমালাতে তৈরী করেন যা তিনি ১৯০৬ থেকে ১৯১১ এর মধ্যে আঁকেন ।তেমন একটি ছবিতে দেখা যায় রং ও রেখার অপূর্ব সমন্বয়। (দ্র.চিত্র-৪৮) তাঁর নিজস্ব একটি ছবির বুনিয়াদ তখনই তৈরী হয়ে যায় ।এ সিরিজের ছবির মধ্য দিয়েই তিনি বৈশ্বিক জগত তৈরী করেন। বিশের দশকে অবনীন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় ধারায় বেশ কিছু প্রতিকৃতি করতে

দেখা যায় ।এসব ছবিগুলো ইউরোপীয় বাস্তব সম্মত হলেও বেশ একটি নরম পেলব ভাব এসব প্রতিকৃতি চিত্রে দেখা যায়।যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে টানা যেতে পারে। ১৯২০-৩০ সালের দিকে তিনি নানান ধরনের ছবির জন্ম দেন। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর নিজস্ব একটি ঘরানারই প্রকাশ ঘটান। ছবির স্বাক্ষরেও দেশাত্ববোধ ছাপ ঘটান। মুঘল সময়কার নাস্তালিক লিপির স্টাইলটি সুন্দরভাবে ছবিতে বসিয়ে দেন যা ছবিতে আলাদা মাত্রা দেয়। ১৯৩০ সালের দিকে আঁকা বেশ কিছু ছবিতে এই বাংলা অক্ষরের ব্যাবহার দেখা যায় যেমন-একদিনের খলিফা আবুল হাসান,মশগুল ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩০ সালের দিকে আঁকা 'মশগুল' ছবিটির কথা বলা যেতে পারে হুকো টানারত প্রতিকৃতিতে দেখা যায় উপরে ছবির সন ও 'দেয়ালা' নামটি মুঘল নাস্তালিক শৈলীতে লেখা। বাংলা ক্যলিগ্রাফিকে আরবি শৈলীতে রূপান্তর তাঁর একটি বিশেষ কীর্তি।ছবিটি সম্ভবত ঠাকুর বাড়ির শিশুদের হাতে লেখা 'দেয়ালা' পত্রিকার প্রকাশ করার সময় করা।এতে মুঘল পান্ডুলিপি চিত্রেরই প্রতিফলন ধরা পড়ে ।(দ্র.চিত্র-৪৯)

চিত্র-৪৭, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,উল্লাপাড়া স্টেশন,জলরং,১৯২৭খ্রি.মাপ-৩৬.৮৩ x ২৬.৬৭ সি.এম.সংগ্রহ,রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি,সূত্র *:পেইন্টিংস অব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পপুলার এডিশন*

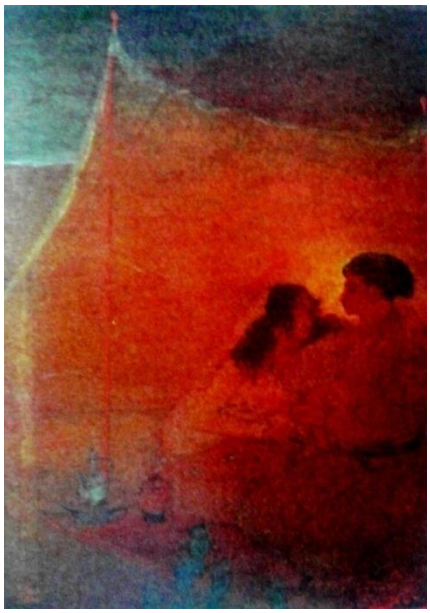

চিত্র-৪৮,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ওমর খৈয়াম’ , আ. ১৯১১-১৯১৬ খ্রি. কাগজের উপর জলরং,

সূত্র:বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

চিত্র-৪৯,অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,‘মশগুল’,জলরং,১৯৩০খ্রি,
সূত্র:ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এলবাম

১৯২৫ সালের দিকে আঁকা পশুপাখির চিত্রেও তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়।ভারতীয় ছবির ইতিহাসে পশুপাখির চিত্র একটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। সভ্যতার যুগের শুরু থেকেই এই চিত্র প্রবাহিত হতে দেখা যায় ভারতীয় শিল্পে।অজন্তা থেকে শুরু করে মুঘল যুগে এর উৎকর্ষতা চরম আকার ধারন করে। অবণীন্দ্রনাথ সেই অতীতের চিরচেনা বিষয়টিই নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ ও কৌতুক রস মিশিয়ে পশুপাখির সহজাত স্বভাব ভঙ্গি পটে উপস্থাপন করেন। যেমন- ময়না, চড়ুই, বুলবুলি, পায়রা, বাঁদর, হরিণ, বিড়াল ইত্যাদি আঁকেন জলরংএ প্যাস্টেলে, কালি কলমের রেখায় সরস ভঙ্গিতে।

মুখোশ আমাদের ঐতিহ্যের একটি অংশ। বিভিন্ন ধর্মীয় পালা পার্বনে অতীত কাল থেকেই এই মুখোশের ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রতিকী এই জিনিসটিকেই মনে করা হয় নিজেকে আড়াল করার বস্তু ।মানুষের মুখের নীচে নাকি থাকে অরেকটি মানুষ বা নিজের মূল সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়ে থাকে এ বস্তুকে দিয়ে।প্রতিকী এ মুখোশ নিয়েও অবণীন্দ্রনাথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ১৯২৯ সালে তাঁর আঁকা মুখোশ চিত্রগুলি কৌতুক রসের মাধ্যমে ব্যক্তির ভিতরের দিক তুলে ধরেন। মহৎ ব্যাক্তি ছাড়াও সাধারণ লোকজনও তাঁর চিত্রে উঠে এসেছে।বিষয় হিসাবে তৎকালীন সময় ছিল এটি অভিনব। 'দিননাথ যখন রঘুপতি' বা 'তপতি' ছবিটির উল্লেখ করা যেতে পারে যা রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে সংগৃহিত আছে।প্রায় ষাট সত্তুরটি মুখোশের ছবির মধ্যে 'তপতি' ছবিটি দশটির মত আঁকা শোনা যায়।এখানে দিননথের চারিত্রিক বৈশিষ্টটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অবণীন্দ্রনাথের সবচেয়ে স্বার্থক চিত্রমালা হচ্ছে **'আরব্য রজনী'** চিত্রকলা যা তিন ১৯৩০ সালের দিকে প্রায় পয়তাল্লিশটি ছবি এঁকেছিলেন। আরব্য রজনীর ছবি গুলিতে তিনি মুঘল শৈলীর স্বার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছেন,অতীত ঐতিহ্য ও বাস্তবের সমন্বয়ে তৈরী এই সিরিজগুলি সম্পর্কে শিল্পী বিনোদবিহারী বলেছেন:

'' যদিও উপলক্ষ্য আরব্য উপন্যাস কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা। শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতাকে বাগদাদের লৌকিক, অলৌকিক ঘটনার সংগে মিলিয়ে দিয়েছেন এমনভাবে যে কালের ব্যাবধানে মুছে গেছে সে ক্ষেত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরের জনস্রোত ও বিচিত্র কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এটিকে আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলী না বলে তাঁর লৌকিক কলকাতা নগরীর কাহিনী বলা অসংগত নয়।''[৮]

এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় আরবের জনপ্রিয় কাহিনীর সাথে তৎকালীন কলকাতার কাহিনীকে চিত্রে ব্যাখ্যা করার জন্য মুঘল শৈলীটিকেই তিনি উপযুক্ত মনে করেন । অবনীন্দ্রনাথ তা স্বার্থকভাবে আধুনিকতার রূপায়ন ঘটিয়ে পরিবেশন করেন যা এক কথায় অভিনব। বিনোদবিহারীর আরেকটি উক্তিতে এ ব্যপারটি আরও স্পষ্টভাবে উঠে আসে। তিনি বলেন:

''এই রচনাগুলির স্বার্থকতা অনুসরণ করতে হলে অলিকের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আরব্য উপন্যাসের প্রতিটি চিত্রই নির্মিত হয়েছে ইমারতের মতো কঠিন করে। জীবজন্তু, মানুষ, সেলাইয়ের কল, হ্যারিকেন-লণ্ঠন, হোটেলের নাম লেখা স্যুটকেশ সব কিছুই ছবির ইমরতী বাঁধনকে দৃঢ়তর করে। কোথাও অসংলগ্নতা বা বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়ায় না।নির্মিতির দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমনি পরম্পরা থেকে অনুরূপ উপাদান আত্মসাৎ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি।''

এই সিরিজ নিঃসন্দেহে তিরিশের দশকের নব্যবঙ্গীয় রীতির মাইল ফলক। এই সিরীজেই অবণীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতার নির্যাস ঢেলে দিয়েছেন। ছবিগুলিতে ওয়াশ এবং গোয়াশ দু পদ্ধতিরই মিশ্রণ দেখা যায়। ছবিগুলির পরিমাপও খুব বেশি নয়। ছবিগুলোতে মুঘল ঘরানার স্থাপত্যিক অলংকরন ধরা পড়ে। তেমনি একটি ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে **'হাঞ্চ ব্যাক এন্ড দ ফিস বোন'** বাংলায় **'কুজো ও মাছের কাটা' ১৯৩০খ্রি.** ২৬.৬ x২৪ সে.মি. মাপের জলরং এ অংকিত ।আরব্য রজনীর জনপ্রিয় একটি গল্প এক দরজি ও তার স্ত্রী এক বিদেশী কুজোকে খাবারে মাছের কাটা মিশিয়ে দিওয়া এবং তাকে শুশ্রুষা করা এই বিষয়ের সাথে ঠাকুর বাড়ির বিদেশী আপ্যায়নের দৃশ্যটি জুড়ে দেন।এ ছবিতে জ্যামিতিক স্থাপত্য দিয়ে পটকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে। এতে দুটো প্যানেল তৈরী হয়েছে দুটো প্যানেলেই সমান দৃস্টিপাত করা হয়েছে। ছবিতে ন্যারেটিভ স্টাইলের ভঙ্গি প্রকাশ পায়। সুক্ষ রেখার কারুকাজে, লাল ইটের দালানের নকশা ও ইংরেজি অক্ষরের সাইনবোর্ডে উপনিবেশিক অভিঘাতের প্রতিফলন ছবিতে ধরা পড়ে। ছবিটিতে কোনো ছায়াপাত নেই যা দেখে মনে হয় পূর্ববর্তী মুঘল শৈলীকেই অনুসরণ করে তা করা হয়েছে (দ্র.চিত্র-৫০)।

আরেকটি ছবি হচ্ছে আরব্য রজনীর **'নুরুদ্দীনের বিবাহ' ১৯৩০** খৃ. ২৫.৪ x ২৪.১ সে.মি. মাপের জলরং মাধ্যমে অংকিত এ ছবিতে দেখা যায় মুসলিম ঐতিহ্যের বিবাহের ছবি। বর ঘোড়া করে তার সঙ্গি- সাথি নিয়ে বিবাহের মিছিলে সামিল ।এ ছবিটিও জ্যামিতিক রেখাংকনের মাধ্যমে দুটি প্যানেলে ভাগ করা উপরে দেখা যায় বিবাহের তোরণ, সামিয়ানা, বিবাহের মিছিল একদিকে নাকারা বাজাচ্ছে অন্যদিকে দেখা যায়

নীচের প্যানেলে রান্নার আয়োজন চলছে। স্থাপত্যের মধ্যেও নতুনত্বের আবির্ভাব ঘটান। স্থাপত্যে পুরোনো স্টাইলের সাথে তৎকালীন ভিক্টোরিয়ান স্টাইলটিও জুড়ে দেন। সমস্ত কিছু নিয়ে কম্পোজিশনটির ফোকাস উপরেই পড়ে। মুঘল ঘরানার মিনিয়েচার ঢংটি বজায় রেখে এর সমকালীন বাস্তবতা তুলে ধরেন তৎকালীন প্রেক্ষাপটে(দ্র.চিত্র-৫১)।

চিত্র-৫০, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হ্যাঞ্চব্যাক অফ দ্যা ফিশ বোন', জলরং,১৯৩০খ্রি.

সূত্র:বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন

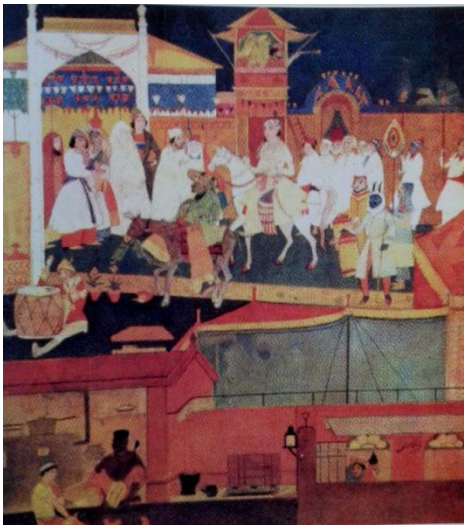

চিত্র-৫১, অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'নুরুদ্দীনের বিবাহ',কাগজে জলরং, ১৯৩০খ্রি.

সূত্র:বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন গ্রন্থ

‘ওয়াজির ও শাহজাদী’ ছবিটিও আরব্য রজনী চিত্রমালার একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। ১৯৩০ খ্রি. ২৮ x ১৯ সে. মি.। জলরং অংকিত এ ছবিতে দেখা যায় মানুষের শরীরের প্রাধান্য বা ব্যাকগ্রাউন্ডের স্পেসকে শূন্য রেখে মানুষ্য শরীরকে উচ্চকিত করা হয়েছে।রং এর কোমলতা দেখা যায় যাতে কাব্যিক ভাব ফুটে উঠে। উপরে মুঘল পান্ডুলিপী চিত্রের মত অক্ষর বিন্যাস দেখা যায় ।ভার্টিকেল কম্পেজিশনের এ ছবিতেও উপরে নীচে দুটো ফিগার উপস্থাপিত হয়েছে ।উপরে আলাপরত ওয়াজির ও নীচে শাহজাদীকে দেখানো হয়েছে। সুক্ষ রেখায় কারসাজীতে পোষাক পরিচ্ছদ, মুখের অভিব্যাক্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী (দ্র .চিত্র-৫২)।

এই আরব্য রজনী চিত্রমালার পর আর কোন চিত্র আঁকতে দেখা যায় না দীর্ঘ আট বৎসর তিনি ছবি আঁকেননি তাই বলে তাঁর সৃষ্টির উম্মাদনা থেমে থাকেনি তাঁর লেখনি চলেছে অবারিত। সেই সময় যাত্রাপালা নিয়ে মেতে উঠেন এবং অনেকেই বলেন এই যাত্রাপালা সাহিত্যের এক নতুন সংযোজন।যাত্রাপালার পান্ডুলিপি‘খুদ্দুর যাত্রার’ চিত্রায়ন করেন তাঁর পূর্ব রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কোলাজ কায়দায় ।বাজারের নানান পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ছেড়া অংশ,লেবেল,প্যাকেট ইত্যাদি জোড়া দিয়ে নানান আদল তৈরী করেন অনেকটা ইউরোপীয় সংশ্লেষিক ঘনকবাদের মত করে। এতেও তাঁর নিজস্ব সৃস্টির রূপটি ধরা পড়ে। দীর্ঘ বিরতী সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ‘জোড়া সাঁকোর ধারে’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

‘‘ দশ এগার বৎসর ছবি আঁকিনি। আরব্য উপন্যাসের ছবির সেট আঁকা হলে ছেলেদের বললুম, এই ধরে দিয়ে গেলুম, আমার জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে। ব্যাস তারপর থেকেই ছবি আঁকা বন্ধ। কী জানি কেন মন বসত না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম। ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম। বেশ দিন যায়।’’[১০]

এ থেকে বোঝা যায় অবন ঠাকুর সৃষ্টির সমস্তটুকুই ঢেলে দিয়েছিলেন এই চিত্রমালাগুলোতে। তাঁর সমস্ত ছবি বিশ্লেষণ করলেও তাই দেখা যায় যে ১৯৩০ এর পর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ছবি পাওয়া যায় না। যদিও দীর্ঘ আট বৎসর পর শিল্পী মুকুল দে’র অনুরোধ ছবি আঁকা ধরেন ১৯৩৮-৩৯ সালের দিকে। সাহিত্যাশ্রিত ‘কবিকঙ্কন চন্ডী’ ও ‘কৃষ্ণামঙ্গল’ এ দুটি চিত্রমালা তিনি আঁকেন পটুয়া শিল্পীদের মত শুধু তুলির আচড়ে। এই চিত্রমালায় তিনি বিচিত্র সব মাধ্যমের মিশ্রণ ঘটান যেমন- জলরং, প্যাস্টেল রং, কালিকলম, চারকোল ইত্যাদি। তৎকালীন সময়ে এই মিশ্র মাধ্যমের কাজ ছিল অভিনব এবং জনপ্রিয় করার দাবিদারও তিনি। ১৯৩৮ সালের করা ‘গোসাপ’,‘কেশী বধ’,‘কালকেতু’তেমনি একটি ছবি ১৯৪০ সালের

দিকে স্থাপনা শিল্প বা যোগ শিল্প (assemblage art) কাটাম-কুটুম তৈরী করেন একেবারে নিজস্ব আঙ্গিকে দেশীয় ভাবনায়।

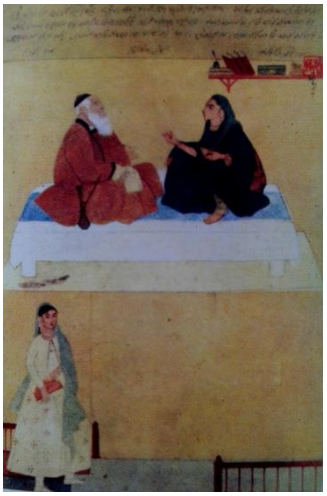

চিত্র-৫২, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর , 'আরব্য রজনী চিত্রমালা'ওয়াজির ও শাহজাদী ',
জলরং, ১৯৩০ খ্রি. ২৮ x ১৯ সে.মি.সূত্র: *বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন*

তৎকালীন সময় বলা হয় উত্তর আধুনিকতার মূলমন্ত্রটি তিনিই তৈরী করে দেন। শিল্পের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অফুরন্ত। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধবালাতে তিনি বলেছেন,``art is love-আর্টের মূলে ভালবাসা''[১১] অর্থাৎ ভালবাসা না জন্মলে আর্ট হয়না। প্রথমে আর্টকে আপন করে নিতে হবে তারপর সেটিকে সকলের সাথে ভাবযুক্ত করতে হবে অর্থাৎ ছড়িয়ে দিতে হবে। এই কাজটিই তিনি করেছেন তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে ভারতীয় ছবির ঐতিহ্যকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেড়েছেন। নানান ঐতিহ্যের মধ্যে ভারতীয় মুঘল শৈলীটিই যে তাঁর একমাত্র আরাধ্য তা অবণীন্দ্রনাতের ছবির পর্যালোচনায় প্রতিয়মাণ হয়। ছবির পোষাক পরিচ্ছদেও মুঘল শৈলীর প্রকাশ দেখা যায় তা 'শুক্লাভিসার' থেকে'দা সিদ্ধাস অফ দা আপার এয়ার'ছবি লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে।তেমনি নানান ছবির মধ্যে উল্লেখ করতে হয় দিল্লীর ন্যাশনাল গ্যালারিতে সংগৃহিত মুমতাজ ,এমপেররস মার্চ টু কাস্মির ও শাহ আলমের প্রতিকৃতির ছবির কথা যেখানে মুঘল শৈলীর নির্যাসটিকে দান করেন নিজস্ব ভাবালুতায়।**'শাহ আলমের প্রতিকৃতি'**টির দিকে তাকালে বিশাল মুঘল সম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু মেজাজটি বোঝা যায় ।এখানে দেখা যায় শাহ আলম মেঝেতে বসে উর্ধমুখে তাকিয়ে হয়ত ঈশ্বরের কাছে আর্জি পেশ করছেন।প্রতিকৃতির পেছনে মুঘল যুগের বিখ্যাত পিয়েত্রা ডুরা নকশা যা মুঘল বিত্ত বৈভবকে নির্দেশ করে।ছবিতে শাহ আলমের তাকানোর ভঙ্গিতে করুন রসের সৃস্টি হয়েছে

(দ্র.চিত্র-৫৩) ।এ থেকে বেঝা যায় অবন ঠাকুর ছবিতে রস সৃস্টি করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত অর্থাৎ এদিকটায় তিনি আধুনিক ভারতীয় ছবির পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন। প্রথমদিককার ছাত্র-ছাত্রী এবং দ্বিতীয় দিকের ছাত্র-ছাত্রীদের তুমুল কাজে নব্য বঙ্গীয় ঘরানার সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন সকলকে এবং পরবর্তিতে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ভারত থেকে বহির্ভারতে ভারতীয় এই আধুনিক নবধারাটি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। এখানে উল্লেখ্য যে, শেষের দিকে এই ধারাটি স্থিমিত হয়ে আসলেও উপনিবেশিক আমলে এই অবণীন্দ্রনাথকৃৎ এই শৈলীটি ভারতীয় চিত্রকলায় নব্যজাগরনে বিশাল ভূমিকা রাখে।

চিত্র- ৫৩, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,বাদশা শাহ আলম, ওয়াশ এন্ড টেম্পারা অন পেপার,২৫.১ x ৭.৮সে.মি.
সংগ্রহ : ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট, সূত্র-মার্গ পত্রিকা (ভলিউম ৫৩)

আবদুর রহমান চুগতাই (১৮৯৭-১৯৭৫ খ্রি.) ছিলেন অবিভক্ত ভারতের লাহোরের শিল্পী ।বিশ শতকের বিশেষ করে দেশ ভাগের আগে ও পড়ে ভারত পাকিস্তান উভয় দেশেই খুব জনপ্রিয় একজন শিল্পী ছিলেন।তাঁর শিল্পকর্ম দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্য হিসাবে গন্য করা হয়।তিনি লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টের ছাত্র ছিলেন ১৯১১ সালের দিকে।সেখানে তিনি অবনীন্দ্রনাথের স্বনামধন্য ছাত্র সমনেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে শিল্প শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং বেঙ্গল স্কুল দ্বারা প্রভাবিত হন। এই শিল্পী 'নব্য বঙ্গীয়' ধারা রপ্ত করতে অবনীন্দ্রনাথের কাছে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবড়িতে এসে শিক্ষা গ্রহন করেন এবং এই ধারাটির স্বার্থক অনুসারী। পরবর্তিতে তিনি লন্ডনে প্রিন্ট মেকিংএরও তালিম নেন।'নব্যবঙ্গীয়' ধারাটি

বিস্তারে আবদুর রহমানের ভূমিকা অগ্রগন্য। এই রীতির যে মূল নির্যাস অজন্তা, মুঘল , জাপানী চিত্রকলায় দেখা যায় তার স্বার্থক রূপায়ণ ঘটে আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের কাজে । চুঘতাইকে মাস্টার পেইন্টার হিসাবে অভিহিত করে 'নিউয়র্ক গ্রাফিক সোসাইটি' ১৯৫১ সালে `Fine Art Reproductions: Old Modern Masters' নামক গ্রন্থে।[১২] মুঘল চিত্রকলার রমনীর যে মেহিনীশক্তি, পেলবতা, চিত্ত চঞ্চল সৃষ্টিকারী দৃষ্টি তা সুন্দরভাবে চিত্রে উপস্থাপন করেন। এসব চিত্র তিনি সৃষ্টি করেন আপন ভাব লাবন্য সংযুক্ত করে। তাঁর চিত্রে বিচিত্র বিষয় দেখা যায়, ইসলামী সাজুয্য যেমন চিত্রে দেখা যায়,তেমনি হিন্দুদের পৌরাণিক ঘটনা ছাড়াও তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটও তার চিত্রে উঠে আসে। তেমনি একটি ছবি হচ্ছে। **'কবির অন্তদৃষ্টি (পোয়েটস ভিসন)'** ১৯৪২-৪৫ খ্রি.ছবির মাপ ৪৯.৫ x ৫৭.৭ সে.মি।ছবিতে সুক্ষ তুলির আচড়ে কবির মুখমন্ডল অংকিত হয়েছে ।কবির সামনে উপবিষ্ট কবির প্রেয়সী যা কবির কবিতার অনুপ্রেরনা।মুঘল কায়দায় অলংকরন দেখা যায় ব্যাকগ্রাউন্ডে কুলুঙ্গি, কার্পেট ইত্যাদিতে (দ্র.চিত্র-৫৫) ।ঢাকা চারুকলা অনুষদে সংগৃহীত **'মা ও শিশু'** ছবিটিও একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম। ছবিটিতে মা ও শিশুর নিবিঢ় ভালবাসা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটি বৃক্ষের নীচে মা তার নিস্পাপ শিশুটিকে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন।ছবিটি প্রতিকী ।বৃক্ষ যেমন ফল ফুল দিয়ে পৃথিবীকে বাচিয়ে রাখে তেমনি মাও তাঁর সন্তানকে আদর ভালবাসা খাদ্য দিয়ে আগলিয়ে রাখে। কুয়াশাচ্ছন্ন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড যা কুহেলিকা তৈরী করে এবং সামনে পাথরগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়ানো ছিটানো। মুঘল যুগের স্নিগ্ধ রং এর ছোয়া এ ছবিতে দেখা যায়। রং ও রেখার চমৎকার সহবস্থান চুঘতাইয়ের কাজের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট (দ্র.চিত্র-৫৬)। চুঘতাই ওয়াশ টেকনিক নানানভাবে ব্যবাহার করেছেন কখনও তা স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছে পরিনত হয়েছে। তাঁর ছবির ভান্ডার বিশাল। জলরং ছাড়াও ড্রইং, ছাপচিত্র ইত্যাদি করেছেন বিপুল পরিমাণে। তিনি বিষয় অনুপ্রেরণা নেন মুঘল চিত্রকলা থেকে এবং এর সাথে তিনি ইসলামী সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ যোগ করেন। মুঘল চিত্রের রহস্যময়তা তাঁর চিত্রের পড়তে পড়তে। ভারতীয় চিত্র বিশেষ করে নব্যবঙ্গীয় ধারার সার্থক রূপকার বলা যায় তাকে নিঃসন্দেহে।

চিত্র-৫৪,আবদুর রহমান চুগতাই,'কবির অন্তদৃষ্টি'(পোয়েটস ভিসন),,জলরং,১৯৪২-৪৫ খ্রি.
মাপ- ৪৯.৫ x ৫৭.৭ সে.মি.সূত্র: *বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন গ্রন্থ*

চিত্র-৫৫, আবদুর রহমান চুগতাই,'মা ও শিশু', জলরং,৫৪ x ৪৯ সে.মি.সংগ্রহ-ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট সংগ্রহশালা
সূত্র:চারুকলা জার্নাল ভলিউম ১ও ২ গ্রন্থ

মুঘল মিনিয়েচারের অনুষঙ্গ দেখা যায় চুঘতাইয়ের **'শাহজাহান এবং ওস্তাদ আহম্মদ মিনার** ' নামক চিত্রে।এখানে দেখা যায় জ্যামিতিক বুনোটে ঠাসা স্থাপত্যিক অলংকরণ।সম্রাটকে দেখা যায় স্থাপত্যিক

সমাধানে ব্যাস্ত পাশে ওস্তাদ মিনার দারিয়ে।পেছনে আমির ওমরাহদের মুখাবয়বে উৎসাহ উদ্দিপনার ছাপ স্পস্ট।প্রত্যেকের মুখের আলাদা ভাব প্রকাশ পায়।ছবিতে খুব বেশি রংএর প্রাধান্য দেখা যায় না শুধু সবুজ ও হলুদের প্রাধান্য দেখা যায় বেশি (দ্র.চিত্র-৫৫)। চুঘতাইয়ের ছবির বিশেষ দিক হচ্ছে রংএর পেলবতা।রং নিয়ে তিনি নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন । ছবিতে কখনও তিনি উষ্ন রং(warm colour) আবার কখনও তিনি শীতল রং(cool colour) ব্যাবহার করেন।কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে কোন রং দৃস্টিকটু হয়ে ধরা দেয় না।চুঘতাইয়ের ড্রইংএর হাতটিও প্রথম শ্রেণীর । তেমনি একটি ছবির উদাহরণ টানা যেতে পারে **'আনারকলি'**। হালকা জলরংএ অংকিত এ ছবিতে হাস্যোজ্বল মেয়েটির হালকা ব্রাউন রংএর ওয়াশের ভেতর শরীরের বহিঃরেখা(outline) স্পস্ট হয়ে উঠেছে। পোষাকের ডিজাইন থেকে শুরু করে অঙ্গেও প্রতিটি অলংকার সুক্ষ থেকে সুক্ষতায় নির্ণিত।ছবিটি একপাশ(profile) থেকে অংকিত যা মুঘল যুগের প্রতিকৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।ছবিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের অজন্তা যুগের নারী দেহের বৈশিষ্ট্য যেমন-চম্পক আঙ্গুলি ,হরিণী নয়ন,মরাল গ্রীবা ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (দ্র.চিত্র-৫৬)।

চিত্র-৫৬, আবদুর রহমান চুগতাই ,শাহজাহান এবং ওস্তাদ আহম্মদ মিনার ,জলরং ,সূত্রঃ পিন্টারেস্ট. কম, চুগতাই পেইন্টিং,তারিখ১৫/০১/১৯

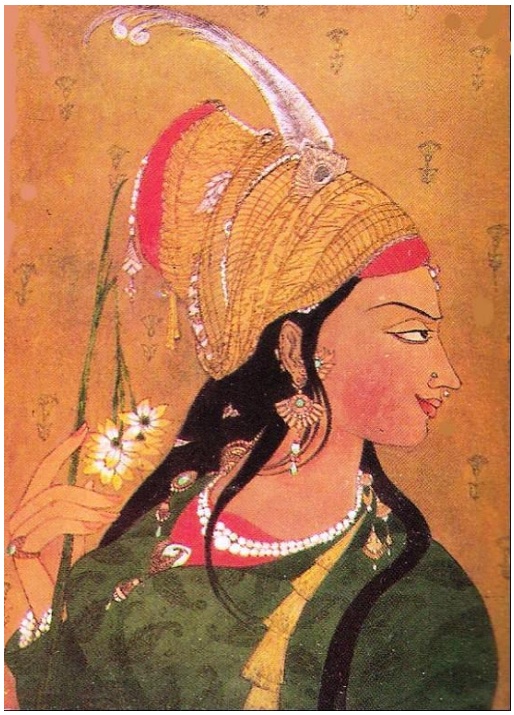

চিত্র-৫৭,আবদুর রহমান চুঘতাই, আনারকলি,জলরং,সূত্রঃ পিন্টারেস্ট.কম,চুগতাই পেইন্টিংস,তারিখ১৫/০১/১৯

আবদুর রহমানের কাজে অসাম্প্রদায়িক চেতনাটিও আলোচনা সাাপেক্ষ ।ভারতীয় বৈষ্ণব ধারার কাজের এক স্বার্থক রূপায়ন তাঁর কাজের মধ্যে লক্ষ্য করে থাকব ।'নব্যবঙ্গীয়' রিতীতে বৈষ্ণব ধারার কাজের যে সন্ধান পাওয়া যায় যেমন-গগনেন্দ্রনাথ,ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদারের কাজে তাঁর মধ্যে চুগতাইয়ের নামটিও থাকবে অগ্রগন্য ।বেশকিছু ছবির খবর পাওয়া যায় 'যোদ্ধা অর্জুন' 'হোলিনৃদত্য'ইত্যদি ।বিশেষ করে উষ্ন রংএ অংকিত **'হোলিনৃত্য'** ছবিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল নাচের ভঙ্গিটি দারুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে (দ্র,চিত্র.৫৭) ।সমস্ত ছবিটি স্বর্গীয় দ্যোতনায় উদ্ভাসিত ।

উপরের কাজ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে চুগতাইয়ের নিজস্ব শৈলী তৈরী হয় ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে দেশ ভাগের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের দিকে ।পূর্বেই বলা হয়েছে এই ধারাটি তিনি পূর্বাপর মুঘল এবং পারস্য ধারা থেকে অনুপ্রাণীত হয়ে নিজস্ব ধারায় পর্যবসিত করেন ।তেমনি তাঁর 'মুরাক্কা-ই-চুগতাই' যা উর্দু কবি আসাদ উল্লা খান গালিবের কবিতা অবলম্বনে তৈরী তাতে দেখা যায় চমৎকার রং ও রেখার সমন্বয় ।উক্ত মুরাক্কায় গালিবের কবিতা ও চুগতাইয়ের কাজ মিলেমিশে এক হয়ে এক অনবদ্য শিল্পকর্মের সৃস্টি করে ।চুগতাইয়ের কাজ বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শিত হতে দেখা যায় যেমন- ১৯২০ সালে 'ইন্ডিয়ান স্কুল

অব ওরিয়েন্টাল আর্ট 'এ এবং একই সময় 'পাঞ্জাব ফাইন আর্ট সোসাইটি'তে।পরবর্তিতে ১৯৩১ সালে 'লাহোরে'।বিপুল কর্মযজ্ঞের অধিকারী এ শিল্পীকে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট 'প্রাইড অফ পারফর্মেন্স' পুরস্কারে ভূষিত করেন ১৯৬৮ সালে।লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের মুরাল অংকনের বিচারক প্যানেলে অন্যতম সভ্য।বর্তমানে তাঁর ছবি সংগৃহিত আছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে,ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অব ইসলামাবাদ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম লন্ডনে।

অবণীন্দ্রনাথ এবং চুগতাইয়ের কাজ পর্যালোচনা করলে অনুধাবন হয় যে ঐতিহ্য পরম্পরা মুঘল আদর্শকেই তাঁরা ভারতীয় চিত্রের আত্মপরিচয়ের জায়গায় বসিয়েছেন।অবণীন্দ্রনাথ 'শিল্পায়ন' গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন : ''শিল্পে অধিকার পেতেই হবে, না হলে আমরা কিছুই পাব না''[১৩] অর্থাৎ এ থেকে প্রতিয়মাণ হয় ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতে শিল্পের সঠিক আদর্শ জায়গাটি তৈরীর নির্দেশ দান করেন।ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে দেখা যায় উচ্চবিত্তের ঘরে ইংরেজদের মত আসবাবপত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ইত্যাদিতে ছেয়ে গেছে সার

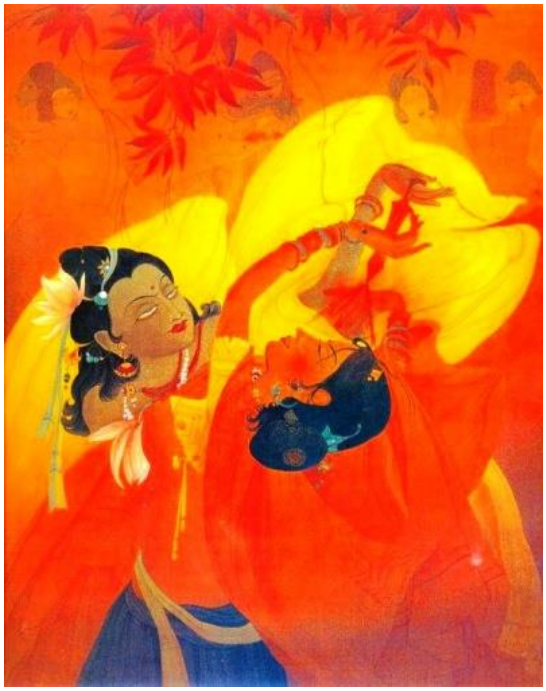

চিত্র-৫৮,আবদুর রহমান চুঘতাই, হোলিনৃত্য,জলরং,সূত্র: *ভারতের চিত্রকলা ২য় খন্ড গ্রন্থ*

ভারত। পরাধীন ভারতে রাজনীতি,ধর্ম সংস্কারের সাথে অবনীন্দ্রনাথ শিল্প সংস্কার পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন। ভারতীয় শিল্প-দর্শনের উৎকর্ষ,মহিমা ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতি ঘটান। শুধু চিত্রই নয় বাংলার গৃহশিল্প (Cottage Industry), নাটকের পট, চেয়ার টেবিল ইত্যাদিতেও দেশি নকশার মিশ্রণ ঘটান।লেখনিতেও তাঁর ঐতিহ্য ফুটে উঠে 'ভারতশিল্প', 'বাংলার ব্রতকথা''ভারতশিল্পের এনাটমি' ইত্যাদি গ্রন্থে ভারতশিল্পের স্বরূপ দেখিয়েছেন।তিনি বলেন:

'' যেখানে জলের অভাব সে জায়গা ছেড়ে জলাশয়ের তীরে গিয়ে বাস করলে বুদ্ধিমন্ত বলতে পারে সবাই,কিন্তু এতে ফল নেই, মনুষ্যত্ব নেই। খরার বুকে ধারা বাহানোতেই আর্ট, খরার ভয়ে ধারার দিকে সরে পড়ায় জিৎ নেই - হারই আছে।''[১৪]

অর্থাৎ তিনি মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়েছেন।যেখানে ভারতবর্ষের শিল্পকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য,কারিগর শ্রেণীর নিম্ন রুচির আর্ট হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন ইংরেজরা সেখানে তিনি ভারতীয় শিল্পকে উচ্চাসনে আসীন করেন।ভারতীয় শিল্পকে 'কবিত্ব'দান করেন।শিল্পীকে কারিগর শ্রেণীর আখ্যা থেকে কবি করে দেন।অবনীন্দ্রনাথ অতীতের কলাবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ জাতিকে টেনে এনে জগতে মহাপ্রাণ করেন।অবনীন্দ্রনাথের আগে যেসব বিখ্যাত শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ বাগচি, বামাপদ ব্যানার্জি এবং শশি কুমার হেশ উল্লেখযোগ্য কিন্তু অবণীন্দ্রনাথ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তিনি ঐতিহ্যের মোড়কে তিনি একটি ভারতীয় আধুনিক শিল্প আন্দোলনের জন্ম দেন যা এর আগে ভারতে সৃষ্টি হয়নি। কেরালার শিল্পী রবি বর্মা সম্পর্কে তিনি বলেন: রবিবর্মাও তো দেশী মতে ছবি এঁকেছিলেন,কিন্তু বিদেশী ভাব কাটাতে পারেননি,সীতা দাড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গিতে। সেইখানে আমার পালা''[১৫] অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন ছবির রূপটি তিনি কিভাবে পরিবর্তন করেছিলেন।এখানে উল্লেখ্য, আধুনিক ভারতীয় শিল্প সৃষ্টিতে তৎকালীন সময়ে শ্রেষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ প্রাগ্রসরদের ভূমিকাও ছিলো অগ্রগন্য ।এরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ই.বি হ্যাভেল ,সিস্টার নিবেদিতা, সি. এফ. এন্ড্রুস, শ্রী অরবিন্দ, আনন্দ কে কুমারস্বামী প্রমুখ।

অবণীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বড় ভাই গগন্দ্রেনাথ ঠাকুর ও ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্যদের মিশ্র প্রয়াসে ওকাকুরার যে কনসেপ্ট ছিল 'Asia is One' অর্থাৎ এশিয়া এক এবং তার স্বরূপটি এক এবং অভিন্ন সেই আলোকে ভারতীয় আধুনিক চিত্র পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য সংজোযন যা ঠাকুর বাড়ীর শিল্পীদের অবদান যা জোড় দিয়ে বলা যেতে পারে ।এর প্রতিফলন ঘটে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্ট ' এই সংগঠনটির দ্বারা এবং এর মাধ্যমে বেঙ্গল আর্ট আন্দোলনটি ভারতীয় প্রাচ্যকলা নাম নিয়ে ভারত ও বহির্ভারতে ভারতীয় চিত্রকলাকে অনন্য উচ্চতায় আসীন হতে দেখা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। রত্নাবলী চট্টোপধ্যায়, ***দরবারি শিল্পের স্বরূপ: মুঘল চিত্রকলা***, কলকাতা: থীমা প্রকাশনী, ২০১৫, প্ৃ৩

২। মৃণাল ঘোষ, ***বিংশ শতকের ভারতের চিত্রকলা : আধুনিকতার বিবর্তন***,কলকাতা: প্রতিক্ষণ, ২০০৫ পৃ ৩৬

৩। শ্রীরাণী চন্দ,***শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ,*** কলকাতা:বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৪০৬ পৃ ৫৩

৪।অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রানী চন্দ, ***জোড়াসাঁকোর ধারে***, কলকাতা; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৮, পৃ ১৩৪

৫। মৃণাল ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯

৬। পার্থজিৎ গঙ্গোপধ্যায়, ***অগ্রন্থিত অবনীন্দ্রনাথ,*** কলকাতা; পত্রলেখা, ২০১১পৃ ১১৯

৭। পার্থজিৎ গঙ্গোপধ্যায়, প্রাগুক্ত,পৃ১১৭

৮। অশোক ভট্টাচার্য, ***বাংলার চিত্রকলা***, কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ২০১০,পৃ ১৮৫

৯। অশোক ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ১৮৫

১০। মৃণাল ঘোষ,প্রাগুক্ত,পৃ১২৫

১১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ***বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী***, কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১২ , পৃ২৭৮

১২। আব্দুস সাত্তার, ***চারুকলা অনুষদে সংগৃহিত শিল্পকর্ম***, ঢাকা: চারুকলা জার্নাল, ভলিউম ১ও ২, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, পৃ৭০

১৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ***শিল্পায়ন***, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড. ২০১৪, পৃ১২

১৪।অসিত কুমার হালদার, ***শিল্পকথা (অবনীন্দ্র-জয়ন্তী),*** কলকাতা; পত্রলেখা, ২০১৫ ,পৃ ১০২

১৫। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী রাণী চন্দ,***ঘরোয়া***,কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৪১৭,পৃ৩২

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

ভারতীয় ছবির মূল চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তা সম্মুখীন হয়েছে নানা শিল্পরসিক ও সমালোচকদের দ্বারা।তাঁদের অনেকেই বলে থাকেন ভারতীয় চিত্রকলায় মানুষের শরীর অংকনে দুর্বলতা আছে অথচ বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের 'চিত্রসূত্রে' বলা আছে মস্তিস্কের দৈর্ঘকেই তাল বা আদিমান রূপে গ্রহন করা হয়েছে অর্থাৎ যার যার মস্তিস্কের দৈর্ঘ অনুসারে তার সমস্ত শরীরকে ভাগ করা হয়েছে ঠিক একথাই লিওনার্দো দা ভিঞ্চি পানের শতকে তাঁর "Notes on a treatise of painting" গ্রন্থে বলেছেন "A man has the length of two heads from the extremely of one shoulder to the other"[১] পরিপ্রেক্ষিত বা perspective জ্ঞান ছিল না ভারতীয় চিত্রে এই বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। অথচ অজন্তার কোন কোন চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতের প্রমান পাওয়া গেছে এবং পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ভারতীয় চিত্র শাস্ত্র বিষ্ণুধর্মত্তোর পুরাণের চিত্রসূত্রে লেখা আছে, সম্মুখে বা পাশ ফিরে থাকা অবস্থায় উচ্চ স্থানকে উচ্চ স্থানের ন্যায়, নিম্ন স্থানকে নিম্ন স্থানের ন্যায় এবং এসব একটি থেকে অপরটি বিভক্ত এসকল যে ফুটিয়ে তুলতে পারে তাকে চিত্রজ্ঞ বলা যেতে পারে।[২]

অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় ভারতীয় চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষিত ছিল কিন্তু তা একটু ভিন্ন মাত্রায় ছিল।আবার ইউরোপীয় রেনেসাঁসে দেখা যায় পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার। মূলত, চৌদ্দ পনের শতকের ইউরোপীয় রেঁনেসাসই ভারতীয় এবং ইউরোপীয় চিত্রের পার্থক্য বলে দেয় এর মূলে ছিল পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাবহার এবং তেল রং এর আবিস্কার । তেলরং এ অনেক বেশি বাস্তব সম্মত এবং তিমাত্রিকতা আনা সম্ভব যা অন্য কোন মাধ্যমে আনা কষ্টসাধ্য। লিওনার্দোর চিত্রের দার্শনিক ব্যখ্যার সুত্র ধরে বলতে হয় 'চিত্রে রূপ রস গন্ধ ' থাকতে হবে এবং এটি পরবর্তীতে ইউরোপীয় চিত্রের চর্চার বিষয় হয়ে দাড়ায়। এদিকে ভারতীয় চিত্রে তেল রং এর মাধ্যম আদৃত হয়নি তা আগেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভরতীয় ছবি ছিল জলরং ভিত্তিক দ্বিমাত্রিকতা নির্ভর। যদিও পনের শতকে ভারতীয় ছবিতে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাবহার দেখা যায়। ভারতীয় ছবির যে মূল থিম বা বিষয় শুধু মানুষের অবয়বই আঁকলে চলবে না তার ভেতরের মানুষকেও তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ তার ভিতরের ধ্যানস্থ মানুষটিকে প্রকাশ ঘটাতে হবে। এই আদর্শগত বিষয়টি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ভারতীয় চিত্রে লক্ষ্য করা যায় ।মহেঞ্জোদারোর শিল্পকলা

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ যাতে দেখা যায় ধ্যনস্থ নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি সম্পন্ন যোগিমূর্তি, পশুপাতির মূর্তি, ধারিত্রীমাতার মূর্তি ইত্যাদি । পরবর্তীতে মুঘল পূর্ববর্তী গুপ্ত যুগে ভারতীয় শিল্প উচ্চমাপে আসীন হতে দেখা যায়। শিল্প সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই এর উৎকর্ষতার প্রমান পাই। চিত্রকলা সাহিত্য একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে । কালিদাসের সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রের আদর্শগত দিক ফুটে উঠে। এই সাহিত্যে প্রকৃতির বর্ননা যেমন উপমাতে পর্যবসিত চিত্রেও ঠিক তাই। প্রানীজাগত উদ্ভিদের ও মানুষের মধ্যে চমৎকার মিলন দেখতে পাই। চোখকে যেমন হরিণের সাথে ,পদ্মপাতার সাথে ও মীনের (মাছ) সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে বা এর মত করে দেখানো হয়েছে। কেশকে চমরীপুচ্ছের ন্যায়, ময়ুর পুচ্ছের ন্যায়, হাতকে লতার ন্যায়, গলাকে মরালের ন্যায়, এইরূপ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির নিছক অনুকরণ নয় প্রকৃতির মোটিফ ও তার আদর্শগত দিক সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে ইউরোপীয় চিত্রে বা সাহিত্যে এমনটি দেখা যায় না। ভারতীয় চিত্রের এই আদর্শগত দিক আমরা ইউরোপীয় চিত্রে দেখতে পাই অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের শুরুতে বাস্তববাদ (Realism) থেকে আদর্শবাদ (Idealism) এর দিকে ঝুকতে শুরু করে এবং বিশ শতকে বেশ কিছু শিল্প আন্দোলনের উপর এ প্রতিফলন দেখতে পাই।সেই সময় দেখা যায় শুধু মানুষের শরীর সংস্থাপনই নয় তার মনের অবস্থাকেও ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেন শিল্পীরা।

১৮৯৬ সালে ই.বি.হ্যাভেল কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে যোগ দেন এবং তিনি ভারতীয় ছবির আদর্শিক ও আধ্যাত্মিকতার দিকে জোড় দেন। ভারতীয় ঐতিহ্যগত শিল্প অজন্তা, মুঘল ও রাজপুত শৈলি বিস্তারে তিনি অবণীন্দ্রনাথকেই যোগ্য অনুসারী ভাবেন।অবণীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যগত শিল্পকে আধুনিকররূপে উপস্থাপন করেন।সেইক্ষেত্রে অবণীন্দ্রনাথকে প্রথম আধুনিক শিল্পী বলা যেতে পারে। যদিও তাঁর শিল্প সমাজ বাস্তবতা,জীবন সম্পৃক্ততা নেই বলে অনেকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।শিল্প সমালোচক আবুল মনসুর তাঁর শিল্পী দর্শক সমালোচক গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলাকে সমসাময়িক জীবনের স্পন্দন ও আর্তি থেকে খানিকটা দূরে বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] তথাপি তিনি পূর্ববর্তী ইংরেজ অনুকৃত ভারতীয় ছবিকে মুক্তি দিয়ে কবিত্ব দান করেন।শিল্পে জাতীয় অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন।অবনীন্দ্র পূর্ববর্তী ভারতীয় ছবি লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেখানে আধুনিক ভাষার অনুপস্থিতি। তিনি ভারতীয় ছবিকে আধুনিক ভাষা দান করেন।এসব চিত্রে ঐতিহ্যগত মুঘল শিল্পকেই তিনি আদর্শ হিসাবে আইকনিক রূপ দেন।‘আরব্য রজনী’ চিত্রমালায় তিনি আরবের কাহিনীকে বিংশ শতকের কলকাতার অলিগলিতে এনে ফেলেন।এখানে উল্লেখ্য

যে,যেসব সমালোচক সমাজ বাস্তবতা নেই বলে উল্লেখ করেন এই আরব্য চিত্রমালায় অথচ দেখ যায় আরবের কাহিনীর সাথে তিনি তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতাকেও তুলে ধরেন ।

অবণীন্দ্রনাথ ও আব্দুর রহমান চুঘতাই অবিভক্ত ভারতে বিশেষ করে কলকাতা,পাঞ্জাব থেকে বহির্ভারতে প্রাচ্যকলা বিস্তারে অগ্রগন্য ভুমিকা রাখেন। এখানে 'অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আব্দুর রহমান চুগতাইয়ের চিত্রকলায় মুঘল শৈলী ও প্রাচ্য শিল্পের ভাবনা' নামক অভিসন্দর্ভের গবেষণার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে গবেষণাটি কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলার অন্তর্গত বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণান্তে এ সমস্ত বিষয়ের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করার প্রয়াস করা হয়েছে যার ভিত্তিতে এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা,বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বলয়ে এর ঐতিহাসিক,নান্দনিক উৎকর্ষতা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে পারে ।

তথ্যসূত্রঃ

১। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ***ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা***, কলকাতা,চিরায়ত প্রকাশন ২০০৬,পৃ ২৫

২। প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

৩। আবুল মনসুর, ***শিল্পী দর্শক সমালোচক,***ঢাকা,মুক্তধারা,১৩৯১,পৃ৪৮

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট- ১

অসিত কুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৬ খ্রি.)

পিতা সুকুমার হালদার ও মাতা সুপ্রভাসুন্দরী দেবীর সন্তান হলেন অসিত কুমার হালদার।সুপ্রভাসুন্দরী ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা শরৎকুমারী দেবীর মেয়ে এবং সেই সূত্রে অসিতের জন্ম হয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে।ছোটবেলা থেকেই শিল্প সংস্কৃতির আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন অসিত। পটুয়া শিল্পী ঝড়েশ্বর চক্রবর্তীর কাছে খুব ছোটবেলাতেই তাঁর চিত্রের তালিম হয়।ছাত্র থাকাকালীন অবস্থাতেই অসিত মূর্তি গড়ার কলাকৌশল আয়ত্ত করেন যদুনাথ ও বক্রেশ্বর পালের কাছে।ভাস্কর্যের করণকৌশল শেখেন সরকারী স্থপতি ও ভাস্কর লিওনার্ড জেনিংসের কাছে।কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে সহকারী অধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ।লেডি হেরিংহামের নেতৃত্বে লন্ডনের 'ইন্ডিয়া সোসাইটির' উদ্যোগে ১৯০৯-১৯১১ সালে নন্দলাল বসুর সঙ্গে অজন্তা গুহাচিত্রের অনুলিপি অংকনে অংশগ্রহণ।কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুল ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে কিছুদিন খন্ডকালীন শিক্ষকতা করেন।তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং সেই সময় শান্তিনিকেতনের উৎসব অনুষ্টানে মঞ্চসজ্জা,অভিনয়,আলপনা ইত্যাদি অংশগ্রহণ ছিল লক্ষ্যনীয়।ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র সচিত্রকরণে তাঁর আঁকা ছবির উল্লেখ পাওয়া যায়।সুহৃদ পিয়ার্সনের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমন এবং ফিরে এসে জয়পুর আর্ট স্কুল ও পরে লিক্ষ্নৌ আর্টস্কুলে ১৯২৪ সালে অধ্যক্ষ পদে যোগদেন।লক্ষ্নৌ সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ে ১৯২৫-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি স্থায়ী অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন।প্রথম ভারতীয় ফেলো হিসাবে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্ট থেকে স্বীকৃতি লাভ। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হল- 'রাসলীলা',আকাশ প্রদীপ,'বুদ্ধদেবের জীবন সংক্রান্ত চিত্র', 'সুরের আগুন', যুদ্ধের মূল্য, সংগীত ইত্যাদি।ভারত ও বিদেশে বেশকিছু মিউজিয়ামে তাঁর চিত্র সংগৃহিত আছে।যেমন-রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়াম,ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম,মস্কোর ন্যাশনাল গ্যালারী,ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া এন্ড আলবার্ট মিউজিয়াম ইত্যাদি।

‘সুরের আগুন’ তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।আ.১৯২৫ সালে আকাঁ, ৬৪ x ৪৭.৩০ সে.মি.জলরংএ অংকিত এ ছবি।অসিত কুমার হালদারের এ ছবিতে একটু নিরীক্ষার ছোঁয়া পাওয়া যায়।জলরংএর মুক্ত ব্রাশের স্ট্রোক (stroke) দেখা যায় এ ছবিতে।ছবিতে বীণা বাজনরত যুবতি শুভ্র সাদা শাড়ি পড়িহিত পাথরের গোলকের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে।বীণা বাজনরত যুবতিকে উচ্চকিত করা হয়েছে। সুরের ঐকতানে পৃথিবীকে আবিষ্ট করছে এক ঐন্দ্রজালিক মুর্ছনায়।

চিত্র-৫৯, অসিত কুমার হালদার, ‘সুরের আগুন’, জলরং,৬৪ x ৪৭.৩০সি.এম.

সূত্র:বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা

পরিশিষ্ট-২

কে. ভেংকটাপ্পা (১৮৮৭-১৯৬৫ খ্রি.)

রামায়ণ মহাকাব্যের ছবির সিদ্ধহস্ত ভেংকটপ্পা ছিলেন মহিশূরের শিল্পী। তিনি মহীশূরের চামারাজেন্দ্র টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে শিল্প শিক্ষা শুরু করেন ১৯০২ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত।তিনি কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ১৯০৯ সালে ভর্তি হন। মুঘল ঐতিহ্যের অলংকরণ ও কারুকাজের ছাপ তাঁর ছবিতে পাওয়া যায় । রামায়ণ সিরিজের ছবির মধ্যে বিখ্যাত হল রামের বিবাহ,অগ্নিদগ্ধ লংকা,জটায়ুর সাথে যুদ্ধরত রাবণ,রামের সেতু নির্মাণ,মরিচার মৃত্যু ইত্যাদি।রামায়ণ মহাকাব্যের ছবি ছাড়াও নিসর্গ রচনাতেও তাঁর সমান দক্ষতা পাওয়া যায়। তেমনি একটি ছবি হচ্ছে ১৯১৭ সালে আঁকা **'উটকামন্ডের দৃশ্য'**। ছবিতে চাঁদনি রাতের এক মোহনীয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র-৬০, কে. ভেংকটপ্পা, উটকামন্ডের দৃশ্য, জলরং, ১৯১৭ খ্রি.
সূত্র:বিংশ শতকের ভারতীয় চিত্রকলা:আধুনিকতার বিবর্তন গ্রন্থ

পরিশিষ্ট -৩

ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৭৫খ্রি.)

অবণীন্দ্রনাথের শিক্ষকতার জীবনের প্রথম দিককার ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযেগ্য ছাত্র হলেন ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার ।ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর ছবির একটি স্বকীয় রূপ ফুটে উঠে।তাঁর ছবির বিষয়বস্তু ছিল পুরাণ,ইাতহাস, কাব্য, নানারকম ব্রত ইত্যাদি।পরবর্তিতে রাধাকৃষ্ন ও চৈতন্যের ছবি এঁকে প্রাচ্য কলাকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। এ সম্পর্কে অবণীন্দ্রনাথ বলেন: ''আমাদের মধ্যে তিন জন তিন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। নন্দলাল শিব সিদ্ধ, আমি মুঘল সিদ্ধ আর ক্ষিতিন চৈতন্য সিদ্ধ।'' অবণীন্দ্রনাথ তাঁকে চৈতন্য সিদ্ধ হিসাবে আখ্যা দেন। তিনি দীর্ঘদিন ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তিতে তিনি এর অধ্যক্ষ হন ১৯২০ সালে এবং টানা ২০ বৎসর শিক্ষকতা করেন। এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার অধ্যাপনা করেন ১৯২২ সাল তেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত।

ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদারের অংকিত **পরশ**,জলরং, ১৯২০খৃ. ৩৪.৭সে.মি. x ১৯.১ সে.মি.ছবিতে ভারতীয় মুঘল মিনিয়েচারের ঢং বিদ্যমান। বলা হয়ে থাকে যে অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে কাব্যিক ভাবধারার ছোয়া ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদারের কাজে পাওয়া যায়।তাঁর সমগ্র জীবনের কাজে শুধু জলরং এবং গুরু অবনঠাকুরের ওয়াশ পদ্ধতিই চর্চিত হয়েছে বেশি।বৈষ্নব ধারার চিত্রের সিদ্ধহস্ত এ শিল্পীর কাজে রাধাকৃষ্নের উপখ্যানের চিত্র বিধৃত হয়েছে বেশী।এখানে ছবিতে রাধার কাপড়ের ভাজ এবং চলার ছন্দ স্পস্ট হয়ে উঠেছে এবং দেখা যায় পিছনে লুকিয়ে থেকে রাখাল কৃষ্ন রাধাকে স্পর্শ করতে চাচেছ।ছবিতে গাছের টেক্সচার, লতাপাতা ও ফুলের ডেকোরেটিভভাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-৬১, ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার, পরশ,জলরং,৩৪.৭ x ১৯.১সি.এম.১৯২০খ্রি.
সূত্র:বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং এলবাম ১

পরিশিষ্ট-৪

নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬ খ্রি.)

অবণীন্দ্রনাথ কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ থকাকলীন অবস্থায় প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে নন্দলাল বসু । তিনি এই 'নব্য বঙ্গীয়' চিত্রকলাকে এক অন্যতম উচ্চতায় নিয়ে যান।তাঁর চিত্রের বিষয় বস্তু আঙ্গিকও ছিল নানা বৈচিত্রে ভরপুর । তিনি নানা জায়গা থেকে ছবির বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন । যেমন প্রাচীন ফ্রেস্কো থেকে আরম্ভ করে মুঘল, রাজপুত,জাপানী শিল্প ,বাংলার পটচিত্র ইত্যাদি। মিশরীয় ও আসিরীয় রিতীও তাঁর চিত্রপটে পাওয়া যায়।তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন কাগজ,কাপড়,কাঠ ইত্যাদি।অজন্তা ও জয়পুর উভয় ফ্রেস্কো রিতীতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । ছেলেবেলায় নন্দলালের শিল্পের হাতেখড়ি হয় মূর্তি নির্মাণ দিয়ে।পরবর্তিতে অবণীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধ ও সুজতা' ও 'বজ্রমুকুট' দেখে ছবি আঁকার প্রতি আকৃস্ট হন। ১৯০৫ সালে তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট সকুলে ভর্তি হন এবং অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি নিবেদিতার 'Indian Myths of Hindus and Buddists' পুস্তকের জন্য ছবি আঁকেন। লেডি হ্যারিংহামের নেতৃত্বে অজন্তার প্রতিলিপি অংকন করতে যেসব শিল্পী ভারত থেকে যোগদান করেন যেমন অসিত কুমার , ভেংকটপ্পা,সমরেন্দ্রগুপ্ত এবং এর মধ্যে নন্দলালও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোতে নিজ বাড়িতে 'বিচিত্রা' স্থাপন করলে অন্যান্য শিল্পীদের মত নন্দলালও শিল্পী হিসাবে নিযুক্ত হন। নন্দলাল কিছুদিন কলকাতার 'ওরিন্টোল আর্ট সোসাইটি'র অধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্তিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করলে সেখানে কলাভবনে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। বিচিত্র কর্মকান্ডের এই শিল্পী নাট্যসজ্জা,ভাস্কর্য, কারুকর্ম এবং পোস্টারেও অবদান আছে।তিনি আলপনা অংকনকে এক নবরূপ দিয়েছেন, রেখাধর্মী চিত্রেও ছিল তাঁর অসামান্য অবদান। সারা ভারত এবং ভারতবর্ষের বাইরেও ছিল তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত।বারানসী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ও বিশ্বভারতী তাকে দেশিকোত্তম (ডক্টরেট) উপাধি দেন।পদ্মবিভূষণ উপাধি দেন ভারত সরকার । ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন মিউজিয়ামে ও গ্যালারীতে তাঁর চিত্র সংগৃহিত আছে। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো হল - পার্থসারথী,আশ্রম,চৈতন্যের জন্ম (ম্যুরাল),দোলন চাপা, সাঁওতালদের ফসল কাটার নৃত্য, নটীর পূজা (ম্যুরাল) ইত্যাদি।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতায় সংগৃহিত **'পার্থসারথী'**, ১৯৯২,মাপ ৭২ সে.মি. x ৫০ সে.মি. জলরংএ অংকিত একটি উল্লেখযোগ্য ছবি যা নন্দলালের প্রথম দিকে অংকিত।নন্দলাল যখন ১৯০৯-১০ সাল পর্যন্ত

অজন্তার অনুলিপি অংকনে ব্যাস্ত ছিলেন সেই সময়কার প্রতিফলন পাওয়া যায় এই ছবিতে।মহাভারতের একটি মুখ্য চরিত্র হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ন এবং তাঁর অপর আরেকটি নাম হচ্ছে 'পার্থ'। পান্ডব বীর অর্জুনের রথ চালক হিসাবে সারথী উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে তাঁকে পার্থসারথী ডাকা হয়।কারণ কৃষ্ন কৌরব বীর দুর্যোধনকে কথা দিয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ন অস্ত্র ব্যাবহার করবে না।অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাঁকে অধর্মের পতন এবং ধর্ম প্রতিষ্টানের জন্য কৃষ্ন মুখনিসৃত বাণী প্রদান করে তা পরবর্তীতে 'মগবগবত গীতা' হিসাবে স্বীকৃত হয়। হিন্দু সমাজের জীবন ও দর্শন এতে নিহিত। ছবিতে দেখা যায় পার্থ (কৃষ্ন) বাম হাতে রথের রশি ও ডান হাতে বাণী প্রদানরত। পিছনে পান্ডব বীর অর্জুনের একটি হাত ও তাঁর ধনুক (গান্ডীব) এর কিছু অংশ দেখা যাচেছ।ছবিটিতে মহান ভাব ব্যাঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

চিত্র-৬৩,নন্দলাল বসু, পার্থসারথী, জলরং,৭২ x ৫০সি.এম,১৯১২ খ্রি.

সূত্র:বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং এলবাম ১

পরিশিষ্ট-৫

বীরেশ্বর সেন (১৮৯৭-?)

অবনীন্দ্রনাথের কৃতি ছাত্রদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বীরেশ্বর সেন।উনার পিতা শৈলেশ্বর সেন ছিলেন ভাগলপুর কলেজের অধ্যক্ষ। বীরেশ্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং বিহারের পাটনাতে ইংরেজির প্রভাষক ছিলেন।চিত্রের প্রতি গভীর মনোযোগ তাঁর ছেলেবেলাতেই পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থাতেই তাঁর ছবি বাংলার মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়। বীরেশ্বর 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্টস ' এও শিক্ষকতা করেন।অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন যা ছিল এইরকম ''তোমার হাতখানা ইচ্ছে করে আমার হাতে কেটে বসিয়ে দি''।পরবর্তীতে বীরেশ্বর লক্ষ্ণৌ গভর্নমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁর ছবির পরিসর ছিল মিনিয়েচারের মত ছোট আঁকারের । উত্তরখন্ডের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর তুলির স্পর্শে কাব্যময় হয়ে উঠেছে। জলরংএর দুটি মাধ্যম ওয়াশ এবং গোয়াশে সাধু, পাখি, একাকি মানুষ,তীর্থযাত্রী, ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলেছেন নানান আঙ্গিকে।

চিত্র-৬৪, বীরেশ্বর সেন, উত্তরখন্ডের নিসর্গের দৃশ্য, জলরং,সূত্র:আর্ট ডায়রি:বিরেশ্বর সেন,তারিখ১০/৩/১৯

পরিশিষ্ট-৬

সুনয়নী দেবী (১৮৭৫-১৯৬২ খ্রি.)

সৌদামিনি এবং গুনেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্যা সুনয়নী দেবী সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের ছোট বোন। তিনিই ঠাকুর বাড়ীর মহিলা শিল্পীদের মধ্যে প্রথম এবং অন্যতম। ছবিতে বাংলার পটের স্বার্থক রূপকার বলা হয় তাকে। তিরিশ বছর থেকে ছবি আঁকা শুরু করলেও খুব অল্প সময়েই শিল্পী হিসাবে নজর কারতে সক্ষম হন। যদিও তিনি প্রথাগত ভাবে ছবি আঁকা শেখেননি। তাঁর ছবির শৈলী বাংলার পট থেকে উৎসারিত।জলরংএ সিদ্ধহস্ত এই শিল্পী বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বাং**লার** লোকায়ত জীবনের রূপ ও প্রতিকৃতি,পৌরাণিক কাহিনীর নানা চরিত্র রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। সুনয়নী দেবীর চিত্র প্রদর্শনী হয় ১৯২৭ সালে লন্ডনের উইমেন্স আর্ট ক্লাবে।ইউরোপেও তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী হয় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের মাধ্যমে।চারুকলা শিক্ষাদান কেন্দ্র কলাভারতীরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা।তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্র বৃন্দাবনের গোপিনী , বাউল, রাধা,বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ন,পদ্মহস্তে কন্যা শিল্পী,মা যশোদা, অর্ধনারীশ্বর ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন মিউজিয়াম ও গ্যলারিতে তাঁর চিত্র সংগৃহিত আছে যেমন- রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, একাডেমী অব ফাইন আর্টস,লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়,মহীশূরের জগমোহন প্যালেস চিত্রশালা, ত্রিবান্দ্রমের শ্রীচিত্রালয়ম, রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়াম ও মাদ্রাজের আর্ট গ্যালারী ইত্যাদি।

সুনয়নী দেবীর **'রাধাকৃষ্ন'** ছবির মাধ্যম জলরং ও গোয়াশ, মাপ ২৫.৪ x ৩৮.২ সে.মি.। অত্যন্ত বলিষ্ঠ রেখায় ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।ছবিতে রাধাকে লোকায়ত ঘরের মেয়ে হিসাবে উপস্থাপন করেছেন একেবারে বাহুল্যবর্জিতভাবে। কৃষ্ন রাধার প্রণয় একেবারে স্বার্থকভাবে ফুটে উঠেছে এ ছবিতে।ছবিতে মোটা ব্রাশের আচড় দেখা যায়। সুনয়নী দেবীর রেখার হাত খুব বলিষ্ঠ।অনেক পন্ডিত ব্যাক্তি বলে থাকেন সুনয়নী দেবীই লোকায়ত ধারার আধুনিক প্রয়োগের স্বার্থক শিল্পী।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬৫,সুনয়নী দেবী,রাধাকৃষ্ন, জলরং ও গুয়াশ,৫৪.৫ x ২৭.৫ সি,এম,১৯২০ খ্রি.

সূত্র-বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং এলবাম ১

পরিশিষ্ট-৭

সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮৭-১৯৬৪ খ্রি.)

এই শিল্পীর বাংলার বাইরে নব্যবঙ্গীয় রীতির প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।বিশেষ করে পাঞ্জাবে প্রাচ্য রীতির প্রসার যার প্রেক্ষিতে শিল্পী আব্দুর রহমান চুগতাইকে পাওয়া যায়।প্রাচ্য রীতির অনুসারী হলেও শেষের দিকে তাঁর কাজে ইউরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট ধারার ছাপ পাওয়া যায়। শিল্পগুরু বিনোদবিহারী তাঁর কাজ সম্পর্কে বলেছেন,ভারতীয় ও ইউরোপীয় কোন ধারাতেই সে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখতে পারেননি। সমরেন্দ্র লাহোরের মেয়ো স্কুল অব আর্টে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে ১৯১৪ সালে যোগ দেন এবং পরে উক্ত প্রতিষ্টানে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।একাধারে ফরাসি ভাষায় দক্ষ এ শিল্পী প্রাচ্য শিল্প প্রসারে কলকাতা মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় সেই সময় বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন।

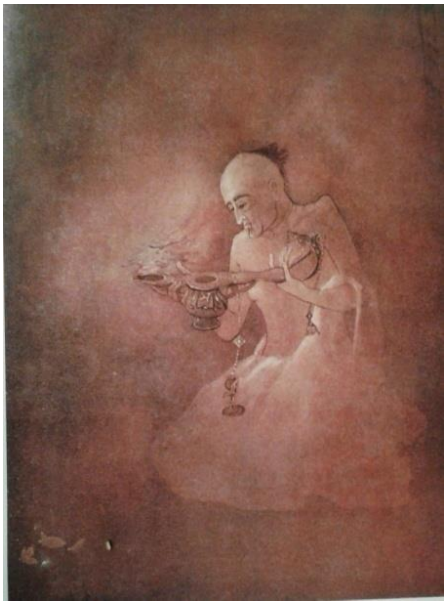

চিত্র-৬৬,সমরেন্দ্রনাাথ গুপ্ত, ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি/হয়ত বাতি জ্বলবে না ,প্রবাসি পত্রিকা,জলরং,

সূত্র:রবীন্দ্রনাথের গানের ছবি গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায় (১৮৮৫-১৯০৯ খ্রি.)

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম যশোরে এক গরীব ব্রাম্মন পরিবারে। নব্যবঙ্গীয় ধারার শিল্পীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচয়ে স্বল্পায়ু শিল্পী । কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে নন্দলালের পরই শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন।অবনীন্দ্রনাথ ও অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপধ্যায়ের অর্থ আনুকুল্যে শিল্পশিক্ষা গ্রহণের পর অবনীন্দ্রনাথের সুপারিশে যাদুঘরের পোকামাকড়ের ছবি আঁকার কাজে ইস্তফা দিয়ে ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করেন।জানা যায় মাত্র ২৪ বছর বেঁচেছিলেন।তাঁর আঁকার বয়স মাত্র ৪ বৎসর হলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু অসামান্য ছবি রেখে গেছেন অমাদের জন্য। ১৯০৮ সালে আঁকা **'লক্ষণ সেনের পলায়ন'** ও 'বত্রিশ সিংহাসন' ছবির জন্য সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রথম প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হন এবং এই শিল্পকর্মটি বেশ বিতর্কের জন্ম দেয় ও তৎকালীন সময় ভারতবর্ষে বেশ পরিচিতিও এনে দেয়।তাঁর কিছু বিখ্যাত চিত্রকর্ম হচ্ছে লক্ষণের শক্তিশেল,শ্রীরামের সাগর শাসন,নারদ,কার্তিকেয়, নহুশ ইত্যাদি।

চিত্র-৬৭,সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায়, 'লক্ষণ সেনের পলায়ন',জলরং,১৯০৮ খ্রি.সূত্র:ব্লগ.সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি,তারিখ৩/৩/১৯

Dhaka University Institutional Repository

শব্দকোষ

আর্ট নুভো (Art Nouveau):

আর্ট নুভো এটি ফরাসী শব্দ ইংরেজতে যার অর্থ দাড়ায় নিউ আর্ট।উনিশ শতকে শুরু হওয়া এ শিল্প আন্দোলন স্থাপত্য,আসবাবপত্র, জুয়েলারী, চিত্রকলা ইত্যাদিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ভাববাদ আশ্রিত এ শিল্প আন্দোলনে অলংকরণের প্রভাব দেখা যায় বেশী

আর্ট ডেকো (Art Deco): কখনও এটিকে ডেকো শিল্প আন্দোলন হিসাবেও বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সে চিত্রকলা ,স্থাপত্য, জুয়েলারি, ফর্নিচার ইত্যাদিতে অলংকরণধর্মী ডেকো শিল্পের প্রভাব দেখা যায়

আলোছায়া (Chiaroscuro):আলোছায়া নির্মান করে কোন বস্তুর ত্রিমাত্রিকতা ফুটিয়ে তোলা হয়

অ্যারাবেস্ক (Arabesque): রেখাধর্মী ইসলামী নকশাকে বেঝায়

ইজেল চিত্র (Easel Painting): ইজেল একটি কাঠামো যাতে চিত্র আটকিয়ে ছবি আঁকা হয়। সাধারণত ক্যানভাস বা বোর্ড এতে আটকিয়ে দাড়িয়ে বসে বিষয়কে কেন্দ্র করে ইজেলকে স্থানচ্যুত করে চিত্রকর ছবি আঁকতে পারেন

উচ্চকিত রং (High Light): ছবির কিছু অংশে তীব্র আলো দেয়াকে বোঝায়। উচ্চকিত রং চিত্রের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটায়

উষ্ন রং (Warm Colour): লাল, হলুদ, কমলা ইত্যদি উষ্ন রং হিসাবে পরিচিত।এই রংএর আভা বিপদ,উষ্নতা,উত্তেজনা সৃষ্টি করতে ব্যাবহার করা হয়

একরঙা ছবি (Monochrome Painting):এক রং দিয়ে ছবি আঁকাকে বোঝায়

এক কেন্দ্রিক পরিপ্রেক্ষিত (One Point Perspective): দৃশ্যের বস্তুগুলো একটি কেন্দ্রে বা ভ্যানিশিং পয়েন্টে মিলিত হওয়া

কালি-কলম (Pen and Ink): কলম ও কালি দিয়ে অংকিত চিত্র

কঞ্চি সদৃশ্য শরির (Stick Figure): সহজভাবে মানুষ, জন্তু জানোয়ারকে প্রকাশ করা।উদাহরনস্বরূপ রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি দিয়ে মানুষ, জন্তু জানোয়ারকে উপস্থাপন এবং এতে অনেক সময় হাত-পা উপস্থাপান হতে পারে নাও হতে পারে

খোদাইচিত্র (Engraving): এনগ্রেভিং সাধারণত ধাতব পাত বা কাঠে খোদাই করে কালি লাগিয়ে তাতে ছাপ তুলে ছবি করা বেঝায়

খসড়া চিত্র (Sketch): দ্রুত রেখা বা রেখার পর রেখা দিয়ে ছবি আঁকা এতে ত্রিমাত্রিকতার ভাব থাকতে পারে নাও পারে। শব্দটি নানান অর্থে ব্যাবহার হতে পারে কখনও শিল্পী কোনো মুহূর্ত দালিলিকভাবে ধরে রাখতে আবার দেখা যায় শিল্পী খসড়া থেকে পরবর্তিতে অন্য কাজে সহায়ক হিসাবে ব্যাবহার করে থাকেন

ক্ষুদ্রচিত্র বা অণুচিত্র (Miniature): এক ধরনের অণুচিত্র বা ক্ষুদ্র চিত্রকে বোঝায়

গোয়াশ (Gouache):জলরংএর একটি বিশেষ পদ্ধতি যাতে রংকে প্রলেপ এর পর প্রলেপ দিয়ে অস্বচ্ছ করে আঁকতে হয়।এখানে সারফেসের বা জমিনের অংশ বিলোপ হয়ে থাকে।এটি ইতালি শব্দ গুয়াজো (guazzo) থেকে এসেছে

ঘনকবাদ (Cubism): বিশ শতকের অন্যতম আধুনিক শিল্প আন্দোলন হচ্ছে এই কিউবিজম বা ঘনকবাদ।শুধু চিত্রকলায় নয় সাহিত্য এবং স্থাপত্যেও এর ব্যাপক প্রভাব পরে।১৯০৭ সালে সেজান, ব্র্যাক ও পিকাসো দ্বারা প্রবর্তিত হয় এ শিল্প।

চিত্রিত মৃৎপাত্র (Painted Pottery):মৃৎপাত্র বা মাটির তৈরী পাত্র যেটিতে তুলি দিয়ে রং করা হয়

জলরং (Watercolour): জলরং হচ্ছে এমন রং যা সহজেই পানি বা জলের সাথে গুলে যায়।এমন রং এর সাথে জল মিশ্রিত করে ছবি চিত্রায়িত করাকে জলরং বোঝানো হয়

জাতক চিত্র:বুদ্ধের পূর্ব জীবনের কাহিনী অবলম্বনে ছবি

ধৌত রং বা ধোয়া রং (Wash): জলরংএর একটি বিশেষ রীতি। রংএর গোলা দিয়ে কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে তা শুকিয়ে আবার আঁকা শুরু করতে হয়। সাধারণত এটা করা হয়ে থাকে পরিবেশ ও আবহাওয়া তৈরী করার জন্য।প্রাচ্য রীতিতে পদ্ধতি ব্যাবহৃত হয় বেশি

নব্যধ্রুপদীবাদ বা নিও ক্লাসিক্যাল আর্ট (Neo Classical Art): মধ্য সপ্তদশ শতকে ধ্রুপদী শিল্পকে বাঁচাতে নতুন জাগরণ শুরু হয়,ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ধ্রুপদি শিল্পের বেশ কিছু উপাদান এতে ব্যাবহার করা হয়

তৈলচিত্র (Oil Painting): রং এর সাথে তিসির তৈল মিশিয়ে ক্যানভাস,বোর্ড,কাঠ,মোটা কাগজ ইত্যাদিতে রং করা হয়।

প্রাথমিক রং(Primary Colour): লাল, হলুদ, নীল ইত্যাদিকে প্রাথমিক রং বা মৌলিক রং বলা হয়

পারস্য চিত্রকলা (Persian Painting): পারস্য বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইরাণ দেশীয় চিত্রকলাকে বোঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকৃতি (Portrait):মানুষের মুখের আকৃতিকে ফুটিয়ে তোলা বোঝায়।মানুষের মুখের চেহারার বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতিচ্ছবির অনুকৃতি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে

পরিপ্রেক্ষিত (Perspective):পরিপ্রেক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্টিকোণের স্বাভাবিক উপস্থাপন বোঝানো হয়ে থাকে।কাছের জিনিস বড় বা স্পষ্ট এবং দূরের জিনিস ছোট বা অস্পষ্ট এই জিনিসগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত

পুরাণ (Mythology): পৌরাণিক দেবদেবী নির্ভর কাহিনী

ফ্রেস্কো (Fresco): ফ্রেস্কো সাধারণত ভিত্তিচিত্র যা দেয়ালে (wall) করা হয়। দেয়ালে নতুন প্রলেপ দিয়ে তাতে লিখন বা চিত্র অংকন করা বোঝায়। দেয়ালে চিত্র স্থায়ী হয়ে টিকে থাকে

ফ্রেস্কো সেকো (Fresco Secco): দেয়াল শুকনো থাকা অবস্থায় রং,আঠা,জল মিশিয়ে চিত্র আঁকা

ফ্রেস্কো বুনো (Fresco Buno): কাঁচা পেলেস্তারের উপর করা দেয়াল চিত্র

বহুমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিত (Multiple perspective):বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বস্তুকে একটি পরিসরে দেখানো।

বহিরেখা (Outline): কোন কিছুর আকার বা আকৃতির বহিরেখা(outline) বোঝানো হয়ে থাকে যাতে বিষয়ের সুক্ষতা বা ত্রিমাত্রিকতা থাকে না

বুনট (Texture):একটি চিত্রের সারফেস বা জমিনের গুণাগুণ বোঝায়।অর্থাৎ জমিনটি রুক্ষ না মসৃন ইত্যাদি

ভূদৃশ্য (Landscape): ভূদৃশ্যে (landscape) সাধারণত চিত্রায়িত হয়ে থাকে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যেমন- পাহাড়,উপত্যকা,নদী, বন,আকাশ সম্বলিত দূরের বিস্তৃত জিনিস ইত্যাদি। ছবির পট জুড়ে বেশীরভাগ থাকে আকাশ। এখানে পরিবেশ আবহাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা থাকে

ভাববাদ (Romanticism): আঠার শতকের ইউরোপের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা হচ্ছে এই রেমান্টিসিজম যা একাধারে সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগিত,ইতিহাস ইত্যাদিতে এই ধারার প্রতিফলন দেখা যায়।অঠার শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অবেগের উচ্ছাস এবং স্বতন্ত্রতার প্রকাশ ঘটানো

মিশ্রমাধ্যম (Mixed Media):মিশ্রমাধ্যম হচ্ছে দৃশ্যগত আর্টে একত্রে অনেকগুলো মাধ্যমের মিশ্রণ ঘটানো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ক্যানভাস বা কাগজের উপর রং এর প্রলেপের সাথে ইংক,প্যাস্টেল, কাঠকয়লা ইত্যদি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু জিনিস কাঠ,কাপড়, কাগজের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ম্যানারিজম বা রীতিবাদ(Mannerism):ইউরোপে রেনেসাঁস এর শেষের দিকে এই শৈলিটি উৎসারিত হয়।পরবর্তিতে ইতালির high renaissance এর সময় বিশেষ করে ষোল শতকে এই ধারা অব্যাহত থাকে। বারোক রীতিতেও এই ধারার ছায়া দেখতে পাওয়া যায় যা সতের শতক পর্যন্ত প্রবাহিত হতে দেখা যায়

মূল্য বা গুণ (Value): রংএর বিভিন্ন স্তর তৈরী করাকে বোঝায়

মুখের পার্শ্বচিত্র (Profile): এক পাশ থেকে মুখের চিত্রায়ণ বোঝায়

মোটিফ (Motif):বিশেষ একটি রীতি বা ঢং। শিল্পের কোন আকৃতিকে বিশেষ একটি ছাঁচে ফেলা হয় যা বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।এটি প্রতিক হিসাবেও ব্যাবহার হতে পারে

রেখাধমী চির্ত্র (Drawing): রেখা দিয়ে অংকন করাকে বেঝায়

রোকোকো (Roccoco Art): বারোক রীতির পর ইউরোপে আঠার শতকে এই শিল্পধারার প্রভাব দেখা যায়।অলংকরণধর্মী এ শিল্পধারা অন্যান্য শিল্প বিশেষ করে সাজসজ্জাতেও এর প্রভাব পরে

রেনেসাঁস (Renaissance): এর অর্থ দাড়ায় পুনর্জাগরণ। ইতালিতে পনের শতক থেকে ষোল শতক পর্যন্ত দ্রুপদি গ্রীক শিল্পের চর্চা হয়

রিলিফ(Relief): সমতল জমিন থেকে উঁচু করে তৈরী ভাস্কর্য বা নকশা

রৌখিক বা সরল পরিপ্রেক্ষিত (linear Perspective):শুধু রেখা দিয়ে পরিপ্রেক্ষিত বোঝানো হয়ে থাকে

লোকচিত্র (Folk Art):গ্রামীণ কৃষিজীবী লোকজনদের অবসর সময়ে তৈরী শিল্প এক কথায় গ্রামীণ শিল্প

শীতল রং(Cool colour): সাধারণত নীল এবং নীল জাতীয় রংকে শীতল রং হিসাবে অবিহত করা হয়

ষড়ঙ্গ (Six Principles of Art): ভারতীয় ছবির ছয়টি নীতি বা সূত্র

সর্বগ্রাহী রীতি (Eclectic Style): সব জায়গা থেকে আহরণ করা বোঝায় অর্থাৎ যিনি অন্যের যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করে থাকেন।

স্থাপত্যিক ভূদৃশ্য (Architectural Landscape): স্থাপত্য সংলগ্ন দৃশ্য রচনা করাকে বোঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী ও সাময়িকীঃ

আলম, রফিকুল,*উপমহাদেশের শিল্পকলা,* ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স,২০১২

আলম, রফিকুল, *বিশ্বসভ্যতা ও শিল্পকলা,* ঢাকা:চয়নিকা,২০১৪

ওসমান, বুলবন,*চারুকলা পরিভাষা*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ২০০৬

ওসমান, বুলবন,*নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা,* ঢাকা:সময় প্রকাশন,২০০৯

গুপ্ত, মনীন্দ্র ভূষণ,*শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত*, কলকাতা:আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,২০১২

গঙ্গোপধ্যায়, মোহনলাল,*দক্ষিণের বারান্দা,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,আষাঢ় ১৪৯৯

গঙ্গোপধ্যায়, পার্থজিৎ,*অগ্রন্থিত অবনীন্দ্রনাথ,* কলকাতা : পত্রলেখা, ২০১১

ঘোষ, নির্মল কুমার,*ভারত শিল্প ,* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড,১৯৯৫

ঘোষ, মৃনাল, *শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব* , কলকাতা:প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড,২০০৩

ঘোষ, দেবপ্রসাদ,*ভারতীয় শিল্পধারা প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত,* কলকাতা: সাহিত্যলোক,১৯৮৬

ঘোষ, পারুল ,*বাংলার বৈষ্ণবধর্ম সাহিত্য ও দর্শনে,* কলকাতা:করুণা প্রকাশনী,শ্রাবণ ১৩৮৬

চট্টোপধ্যায়, রত্নাবলী, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ মুঘল চিত্রকলা ,* কলকাতা ; থীমা প্রকাশনী ,১৯৯৯

চক্রবর্তী, বিমলেন্দু ,*পৃথিবীর গুহাচিত্র,* কলকাতা;পত্রলেখা. নভেম্বর ১৯৯২

ঠাকুর ,অবনীন্দ্রনাথ চন্দ, রানী , *জোড়া সাঁকোর ধারে,* কলকাতা; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,১৩৫১

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, কলকাতা :আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.ষষ্ঠ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১২

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ,*শিল্পায়ন,* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ষষ্ঠ মুদ্রণ জুলাই ২০১৪৮.

ঠাকুর,শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ চন্দ শ্রীমতী রাণী, *ঘরোয়া,* কলকাতা;বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ভাদ্র১৪১৭

বসু নন্দলল,*শিল্প চর্চা ,*কলকাতা:বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ,মাঘ ১৪১৪

বালা,মলয়,*বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যচিত্রকলার ধারা* , ঢাকা,বাংলা একাডেমি, ২০১৮

ভট্টাচার্য,অশোক,*বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা;পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি,২০১০

মিত্র, অশোক,*ভারতের চিত্রকলা (১ম ও ২য় খন্ড),*কলকাতা;আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,২০১১

মনসুর, আবুল,*শিল্পী দর্শক সমালোক* , ঢাকা: মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মজুমদার, লীলা ,*অবনীন্দ্রনাথ,* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ,আষাঢ় ১৪০২

হোসেন,এ বি এম, *ইসলামী চিত্রকলা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাবাজার,২০০৪

হালদার,অসিত কুমার, *শিল্পকথা,* কলকাতা:পত্রলেখা, সেপ্টেম্বর ২০১৫

রায়, নীহাররঞ্জন , *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, চথুর্ত সংস্করণ,২০০৭ধ

সেন, দীনেশ চন্দ্র,*বৃহৎ বঙ্গ(১ম ও ২য় খন্ড)*,কলিকাতা:দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৩

সেলিম, লালা রুখ(সম্পা),*চরু ও কারুকলা (সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা)*,ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৭

সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য,* ঢাকা;বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী,১৯৯৩

সরকার, পবিত্র, *লোক ভাষা ও লোক সংস্কৃতি*, কলিকাতা:চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড,১৯৯৭

সেন, সুকুমার,*বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা:আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,২০০৮

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান,*মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকা:মওলা ব্রাদার্স,২০১০

নন্দী, সুধীর কুমার , *রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব-সূত্র,* কলকাতা: পি.এম.বাক্চি, ১ বৈশাখ ১৪০৭

Chandra, Pramod,***Mughal Portraiture***,Bombay:Times of India Annual.1962
Coomaraswamy,Anand K.,***Introduction to Indian Art***,Delhi;Munshiram Monoharlal,1969

Das Gupta Sri Paresh Chandra , ***The Excavation at Pandu Rajar Dhibi***, Kolkata;Directorate of Archaeology & Museums , Reprinted 2017

১৮.Haque, Enamul,***Islamic Art in Bangladesh***,Dhaka;Dhaka Museum,1978
১৯.Heinrich,Zimmar,***Myths and Symbols in Indian Art and Civilization,***New York;Pantheon Books,1953

Mitra,Pratip Kumar,***Paintings Eighteenth Through Twentieth Centuries ,***Calcutta ; Directorate of Archaeology Government of West Bengal,Vol. 3 january 1991
২০.Ray, Niharranjan,***Maurya and post –Maurya Art***, Calcutta;Indian council of Historical Research,New Delhi,1975
২১.Welch,Stuart Cray***, Imperial Mughal Painting***,London;Chatto &Windus-1978

Wakanker, V.S , ***The Dawn of Indian Art***,India; Kothari printers,November 1978

সহায়ক পত্রিকাঃ

আজিম, ফয়জুল ,*ঔপনিবেশিক শিল্পের কথা,* ঢাকা;বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সাণ্মাসিক পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা,১৯৯২

আমিন,মোঃ নূরুল,*অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে শিল্পীর দৃষ্টি ও সৃষ্টি* ,ঢাকা;বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সাণ্মাসিক পত্রিকা,দ্বাবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা,২০০৩

ইউসুফ সাজেদা*, ওস্তাদ মনসুর : জাহাঙ্গীরের চিত্রশালার প্রতিকৃতি চিত্রকর* , ঢাকা ; ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা,বত্রিশ বর্ষ-১ম-৩য় সংখ্যা -১৪০৫

ইসলাম,সাইফুলএসএম,*মুঘল চিএকলার উৎকর্ষ সাধনে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ভূমিকা : একটি ঐতিহাসিক অধ্যয়ন,* ঢাকা;বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, মে ২০১৫

খানম, মাহ্মুদা ,*বাংলায় চিত্রকলা বিকাশ: কোম্পানি আমল* ,ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ,ছেচল্লিশ বর্ষ, ডিসেম্বর ২০১২

মজলিস, খান নাজমা, *ঢাকার ঈদ ও মুহাররম মিছিল চিত্রকলার রূপরেখা* ,ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা,চতুর্বিংশ বর্ষ ১ম ২য় সংখ্যা ১৩৯৭

সাত্তার,আব্দুস ,*চারুকলা অনুষদে সংগৃহিত শিল্পকর্ম*, ঢাকা; চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ,ভলিউম ১ ও ২,ডিসেম্বর ২০১২

হক,খাদেমুল একেএম, খানম মাহ্মুদা ,*আকবরের চিত্রশালায় চিত্রায়িত রামায়ণ পান্ডুলিপির নবমূল্যায়ণ* , ঢাকা: ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ,আটত্রিশ বর্ষ,প্রথম- তৃতীয় সংখ্যা ,১৪১১

সাময়িকী ঃ

২২.মনসুর,আবুল,**"বঙ্গের চারুশিল্প জগৎ প্রাচ্যপন্থা বনাম পাশ্চাত্য পন্থা"** ঢাকা:কালি ও কলম,বেঙ্গল সেন্টার, ষষ্ঠ বর্ষ,প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

২৩.রায়, প্রনব রঞ্জন,**"পশ্চিম বাংলার আধুনিক দৃশ্যকলা,"** ঢাকা:কালি ও কলম,বেঙ্গল সেন্টার, ষষ্ঠ বর্ষ,প্রথম সংখ্যা ,ফেব্রুয়ারী ২০০৯

২৪.Ali,Sarwat**,``Contemporary art in Pakistan**,'' Dhaka: Jamini, Bengal Gallery of Fine Arts,August2004

Pal,Pratappaditya ,***Murshidabad,Capital of Fleeting Glory***, Mumbai: Marg ,Vol.54 No.3, 2003

Kumar R,Siva,***Abanindranath and Rabindranath A Creative Dialogue,***centre for Advanced Research in Humanities University of Dhaka,Bangladesh,ND

Kumar R. Siva, ***Culture Specificity, Art Language and the Practice of Modernism:an Indian perspective,*** Mumbai: Marg, Vol 53 No.3,2002

বিশেষ প্রদর্শনীর পরিচিতি-গ্রন্থ (Special Exhibition Catalogue) ঃ

হক , এনামুল, *বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা* **,** ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীর পরিচিতি গ্রন্থ, এপ্রিল ৩-২৮, ১৯৭৮

জোড়াসাঁকোর ছবি, রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শশালা সংগ্রহ,১লা বৈশাখ ১৪২৩, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Bhatia, Usha, ***The Splendour of the Royal Ateliers***, New Delhi: Lalit Kala Series Portfolio No 45 ,Rabindra Bhavan , 1999

Bhattacharya K. Asok, ***Bengal School of Painting Album 1,*** Kolkata: Indian Museum, February 2011 (Re- print Series)

Pundole's , ***Property from the Estate of the late Ernevaz K. Dubesh*** ,Mumbai: Auction Catalogue , April, 2015

Samity, Karyanvayan Rajbhasa,***The Pictuturesque Ganga*** , Kolkata : Victoria Memorial Hall Collection,2014

ইন্টারনেটঃ

www.Abanindranath Tagore- Wikipedia.com.15.01.19

www.Abdur Rahaman Chugtai-wikipedia.com.date15.01.19

www.Pala Painting-Banglapedia.com.date18.12.18

www.Murshidabad Painting-Banglapedia.com.date19.12.18

www.zain Indian paintings wikipedia.com.date19.12.18